চতুর্থ অধ্যায়

রবীন্দ্রনাটকের প্রথম পর্যায় ও সমকালীন বাংলা নাটক

রবীন্দ্রনাথ তাঁর নাট্যচর্চার সূচনালগ্ন থেকেই স্বতন্ত্রধারার সৃষ্টি করেছেন। রবীন্দ্রনাথের স্বাতন্ত্র্যতার প্রকাশ দু'দিক থেকেই হয়েছে, এক. নাটকের কাঠামোগত দিক, দুই. বিষয়বস্তুগত দিক। কিন্তু প্রশ্ন থেকে যায় এই স্বাতন্ত্র্যে পূর্ববর্তী অথবা সমকালীন নাট্যকারদের কোন ছায়াই কি পড়েনি? শেষ বিচারে সে কথাই হয়তো আমরা স্পষ্ট করে তুলব যে রবীন্দ্রনাথ নাট্যচর্চার ক্ষেত্রে তাঁর নিজ প্রতিভার আলোকময়তায় স্বতন্ত্র। কেন এই ভিন্নতা? কোন জায়গা থেকে এবং কি ভাবে ভিন্ন হলেন রবীন্দ্রনাথ তার অনুসন্ধানের প্রয়োজন আছে বলে আমরা মনে করি। তাই এই অধ্যায়ে রবীন্দ্রনাট্যচর্চার প্রথম পর্যায়ে (১৮৮১ - ১৮৯০) অন্যান্য যে সমস্ত নাটক রচিত হয়েছে সে সবের মধ্য থেকে উল্লেখযোগ্য কিছু নাটকের আলোচনার মাধ্যমে রবীন্দ্রনাট্যের সঙ্গে তাদের সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্যের বিষয়টি উপস্থাপন করা হবে।

এক

রবীন্দ্রনাট্যচর্চার প্রথম পর্যায়ের (১৮৮১-১৮৯০) সমকালে যে সমস্ত নাটক রচিত হয়েছিল তার উল্লেখযোগ্য নাটকগুলিকে আমরা কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ করে নিয়েছি।

ক. পৌরাণিক

পার্থপরাজয় নাটক (১৮৮১)	—	মনোমোহন বসু
রামের বনবাস (১৮৮২)	—	রাজকৃষ্ণ রায়
সীতার বনবাস (১৮৮২)	—	গিরিশচন্দ্র ঘোষ
বৃষকেতু (১৮৮৪)	—	গিরিশচন্দ্র ঘোষ

যদুবংশ ধ্বংস (১৮৮৪)	—	রাজকৃষ্ণ রায়
তরণীসেন বধ (১৮৮৪)	—	রাজকৃষ্ণ রায়
নল-দময়ন্তী (১৮৮৭)	—	গিরিশচন্দ্র ঘোষ
দক্ষ-যজ্ঞ (১৮৮৯)	—	গিরিশচন্দ্র ঘোষ

খ. প্রহসন

তিল তর্পণ (১৮৮১)	—	অমৃতলাল বসু
চাটুজ্যে ও বাঁড়ুজ্যে (১৮৮৪)	—	অমৃতলাল বসু
বিবাহ বিভ্রাট (১৮৮৪)	—	অমৃতলাল বসু
হঠাৎ নবাব (১৮৮৪)	—	জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর
বেল্লিক বাজার (১৮৮৭)	—	গিরিশচন্দ্র ঘোষ
দাদা ও আমি (১৮৮৮)	—	উপেন্দ্রনাথ দাস
তাজ্জব ব্যাপার (১৮৯০)	—	অমৃতলাল বসু

গ. গীতাভিনয়

মায়াতরু (১৮৮১)	—	গিরিশচন্দ্র ঘোষ
ব্রজবিহার (১৮৮৩)	—	গিরিশচন্দ্র ঘোষ
হীরার ফুল (১৮৮৪)	—	গিরিশচন্দ্র ঘোষ
আশালতা (১৮৮৮)	—	রাধানাথ মিত্র
নব-বাসর (১৮৮৮)	—	রাধানাথ মিত্র

ঘ. ঐতিহাসিক নাটক

স্বপ্নময়ী (১৮৮২)	—	জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর

ঙ. সামাজিক নাটক

আনন্দময় নাটক (১৮৯০)	—	মনোমোহন বসু
হারানিধি (১৮৯০)	—	গিরিশচন্দ্র ঘোষ

চ. জীবনচরিত মূলক নাটক

চৈতন্যলীলা (১৮৮৬) — গিরিশচন্দ্র ঘোষ

বুদ্ধদেব চরিত (১৮৮৭) — গিরিশচন্দ্র ঘোষ

নাটকের এই শ্রেণীকরণ পূর্ববর্তী নাট্যধারা থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। অর্থাৎ ১৮৫২ সালে 'ভদ্রার্জুন' নাটক রচনার মধ্য দিয়ে তারাচরণ শিকদার যে মৌলিক নাটক রচনার সূত্রপাত করেন সেই থেকে— বিষ্ণু বসু যাকে বলেছেন প্রস্তুতি পর্ব,[১] —১৮৮১-এর পূর্ব পর্যন্ত যে নাট্যধারা সৃজন হয়েছে সেই ধারার মধ্যেই আমরা পৌরাণিক, প্রহসন, গীতাভিনয়, ঐতিহাসিক এবং সামাজিক নাটকের সন্ধান পাই। তারাচরণ শিকদারের 'ভদ্রার্জুন' পৌরাণিক বিষয়বস্তু অনুসারে রচিত। ''প্রধানত কাশীরাম দাসের মহাভারত হইতে অর্জুন কর্তৃক সুভদ্রা-হরণের বৃত্তান্তটি অবলম্বন করিয়া তারাচরণ তাঁহার 'ভদ্রার্জুন' নাটক রচনা করেন।''[২] পৌরাণিক নাটকের মধ্যে অন্যান্য যে সমস্ত নাটক রচিত হয়েছে তাদের মধ্যে হরচন্দ্র ঘোষের 'কৌরব বিয়োগ' (১৮৫৭), মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'শর্মিষ্ঠা' (১৮৫৯), রামনারায়ণ তর্করত্নের 'ধর্মবিজয়' (১৮৭৫) ও 'কংসবধ' (১৮৭৫) নাটক উল্লেখযোগ্য। তবে পৌরাণিক নাটকের মধ্যে পুরাণ প্রয়োগের ভিন্নতা রয়েছে। একটি পুরাণের বিষয়কে অবলম্বন করে হয়ে উঠেছে ভক্তিরসাশ্রিত অন্যটি পুরাণাশ্রিত কিন্তু ভক্তি রসাত্মক নয়। যেমন মাইকেলের 'শর্মিষ্ঠা'। অনেক পরে রবীন্দ্রনাথ পুরাণের বিষয়কে অবলম্বন করে গেঁথে তুলেছেন ভিন্ন মাত্রার নাটক 'চিত্রাঙ্গদা'। প্রহসনমূলক নাটকের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'একেই কি বলে সভ্যতা' (১৮৬০), 'বুড় শালিকের ঘাড়ে রো' (১৮৬০), রামনারায়ণ তর্করত্নের 'যেমন কর্ম তেমন ফল' (১৮৬৫), 'উভয় সংকট' (১৮৬৯), 'চক্ষুদান' (১৮৬৯), দীনবন্ধু মিত্রের 'বিয়ে পাগল বুড়ো' (১৮৬৬), 'সধবার একাদশী' (১৮৬৬), 'জামাই বারিক' (১৮৭২) ইত্যাদি নাটক।

বাংলা নাটকে গীতাভিনয় ধারার সূত্রপাত করেন মনোমোহন বসু (১৮৬৭-১৮৯০)। এই গীতাভিনয়ের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে 'সতী' (১৮৭৩) নাটকের ভূমিকায় তিনি যে কথা লিখেছেন তা উদ্ধারযোগ্য —

> ইউরোপে নাটক কাব্যে গান অল্পই থাকে, আমাদের তথাবিধ গ্রন্থে গীতাধিক্যের প্রয়োজন। ইটী জাতীয় রুচিভেদে স্বাভাবিক। যে দেশের বেদ অবধি গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় ধারাপাত পাঠ পর্যন্ত স্বর-সংযোগ ভিন্ন সাধিত হয় না; যে দেশের লোক সঙ্গীতের সাহচর্য বিরহিত পুরাণ পাঠও শ্রবণ করে না; যে দেশের আপামর সাধারণ জনগণ পরাধীনতার জন্য সর্বপ্রকার হীনতা

> ও দীনতার হস্তে পড়িয়াও পূর্ব গান্ধর্ববিদ্যার উন্নত অঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে নানা রঙ্গে অত্র বঙ্গে যাত্রা, কবি, পাঁচালী ফুল ও হাফ আখড়াই, কীর্তন, তর্জা, ভজন প্রভৃতি নিত্যনূতন সঙ্গীতামোদে আবহমান ঘোর আমোদী; অধিক কি যে দেশের দিবাভিক্ষু ও রাতভিকারীও গান না শুনাইলে পর্যাপ্ত ভিক্ষান্ন পাইতে পারে না, যে দেশের দৃশ্যকাব্য যে সঙ্গীতাত্মক হইবে, ইহা বিচিত্র কি? একথা এত করিয়া লিখিবার কারণ আছে। ... অতএব চরিত্রগত স্বভাবের সমর্থন পূর্বক বাঙ্গালা নাটকে সৎসঙ্গীতের বাহুল্য যতই থাকিবে, ততই লোকের প্রীতির কারণ হইবে, সন্দেহ নাই। নাটকের অন্যান্য অঙ্গে কল্পনা ও বিচার শক্তি যেমন আবশ্যক, গীতি অংশেও তদপেক্ষা ন্যূন হওয়া উচিত নহে।[৩]

'সতী' নাটকের এই ভূমিকার থেকেও আরও পরিষ্কার ভাষায় বাংলা নাটকে গানের প্রয়োজনীয়তা অর্থাৎ গীতাভিনয়ের স্বপক্ষে মনোমোহন বসু বক্তব্য রেখেছিলেন ন্যাশনাল থিয়েটারের প্রথম বাৎসরিক সভায়। আমরা সেই বক্তব্যের কিছু অংশ উদ্ধৃত করছি —

> আমাদের আধুনিক শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকের এরূপ সংস্কার আছে যে, নাট্যাভিনয়ে গানের বড় আবশ্যক হয় না। ইউরোপীয় রঙ্গভূমিতে নাটকাভিনয় কালে গানের অভাব দেখিয়াই তাহারা এই সংস্কারের বশ্যতাপন্ন হইয়াছেন। কিন্তু ভারতবর্ষ যে ইউরোপ নয়, ইউরোপীয় সমাজ আর স্বদেশীয় সমাজ যে বিস্তর বিভিন্ন, ইউরোপীয় রুচি ও স্বদেশীয় রুচি যে সম্যক স্বতন্ত্র পদার্থ, তাহা তাহারা ভাবিয়া দেখেন না। যে স্থানে সকল সময়ে সকল স্থানে সকল কার্যেই গান নহিলে চলে না... যে দেশে কালোয়াতি গান সকলে বুঝিতে পারে না বলিয়া অপর সাধারণের তৃপ্তির নিমিত্ত যাত্রা, কবি, পাঁচালী,মরিচা, তর্জা, ভজন, কীর্তন, ঢপ, আখড়াই, হাফ আখড়াই, পদাবলী—বাউলের গান প্রভৃতি বহুপ্রকার গীতি কাব্যের প্রচলন... যে দেশের হাড়ে হাড়ে যে সঙ্গীতের রস প্রবৃষ্ট হইয়া আছে, তাহাও কি আবার অন্য উপায়ে বুঝাইয়া দিতে হইবে? যাত্রাওয়ালারা স্বভাবের ঘাড় ভাঙ্গিয়া অপ্রাকৃত সং, রং, ঢং ইত্যাদি তামাসা দেখাইবার পরেও সহস্র সহস্র লোকের যে এতদূর চিত্তরঞ্জন করিতে সমর্থ হয়, সে কি শুদ্ধ দেশস্থ লোকের অনভিজ্ঞতা ও গুণ গ্রহণে অনভিজ্ঞতা প্রযুক্ত? কদাচ নহে।[৪]

মনোমোহন বসুর এই বক্তব্যে নাটককে দেশীয় করণ করার প্রতি তাঁর আগ্রহের কথা প্রকাশ পেয়েছে। ইউরোপীয় নাট্যকলার মাধ্যমে যে বাংলা নাটকের মুক্তিলাভ সম্ভব নয় তা পরিষ্কার হয়ে গেছে মনোমোহন বসুর এই বক্তব্যে। ১৮৭২ সালে ন্যাশনাল থিয়েটার প্রতিষ্ঠা বাংলা নাট্য জগতের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এই ন্যাশনাল থিয়েটারকে ঘিরেই বাংলা নাটকের আত্ম-আবিষ্কারের সূচনা। অবশ্য তারও আগে ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে 'হিন্দু মেলা'র প্রতিষ্ঠায় স্বদেশ প্রীতির সূত্রপাত। শিকড় সন্ধানের মধ্য দিয়েই সম্ভব আত্ম-আবিষ্কার। "... আমরা চাই দেশে পূর্বে যাহা ছিল তাহা ধ্বংস না করিয়া তাহাকে সংশোধিত করিয়া লও। আমরা চাই, সেই যাত্রার গান সংখ্যা কমাইয়া ও গাইবার প্রণালীকে শোধিত করিয়া কথোপকথনাদি বিবৃত হউক।"[৫] এই আত্ম-আবিষ্কারের অনুপ্রেরণাতেই গীতাভিনয়ের সৃষ্টি। মনোমোহন বসু যার সূচনা করলেন তা গিরিশ ঘোষের মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত সম্প্রসারিত হল। কিন্তু রবীন্দ্রনাথে এসে বিষয় বস্তু এবং pattern-এর দিক থেকে তার প্রকৃতি গেল ভিন্ন হয়ে।

ঐতিহাসিক নাটক রচনার সূত্রপাত হয়েছিল মাইকেল মধুসূদন দত্তের হাত দিয়েই। তাঁর রচিত 'কৃষ্ণকুমারী' (১৮৬১) নাটকই প্রথম সার্থক ঐতিহাসিক নাটক। সমাজ সংস্কার মূলক নাটকও বাংলা নাটকের সূচনা লগ্ন থেকেই লেখা শুরু হয়েছিল। যেমন বহু বিবাহকে বিষয় করে রামনারায়ণ তর্করত্ন লিখলেন 'কুলীন কুলসর্বস্ব' (১৮৫৪), 'নবনাটক' (১৮৬৬), তারকচন্দ্র চূড়ামণি লিখলেন 'সপত্নী নাটক' (১৮৫৮), হরিশচন্দ্র মিত্র লিখলেন 'সপত্নী কলহ' (১৮৭২)। প্রহসন গুলির মধ্যেও সামাজিক সমস্যার কথা এসেছে। সমাজ সংস্কারও প্রহসনের লক্ষ্য। যেমন মাইকেলের 'একেই কি বলে সভ্যতা', রামনারায়ণ তর্করত্নের 'যেমন কর্ম তেমনি ফল' ইত্যাদি নাটকে সমাজ সংস্কারের উদ্দেশ্য স্পষ্ট। এ কারণে প্রহসন ও সামাজিক নাটকগুলির অবস্থান খুব কাছাকাছি বলে ধরে নেওয়া যায়।

এই সময়কার উল্লেখযোগ্য নাট্যকাররা হলেন মনোমোহন বসু (১৮৬৭ - ১৮৯০), জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৭২ - ১৯০০), অমৃতলাল বসু (১৮৭৫ - ১৯২৮), গিরিশচন্দ্র ঘোষ (১৮৭৭ - ১৯১২) এবং রাজকৃষ্ণ রায় (১৮৭৫ - ১৮৯৩)। এই নাট্যকারদের নাট্যকর্মের সংক্ষিপ্ত পরিচয় উপস্থাপন করা প্রয়োজন বলে আমরা মনে করি। মনোমোহন বসুর সৃষ্টি কর্মের কথা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। বাংলা নাটকে গীতাভিনয়ের তিনিই পথিকৃৎ। ইউরোপীয় আদর্শে মাইকেল-দীনবন্ধু যে নাট্যধারার সূচনা করেছিলেন বাংলা নাটকের আদিপর্বে মনোমোহন বসু সেখান থেকে সরে এসে প্রাচ্য আদর্শে নাটক রচনার সূত্রপাত করেন। তাঁর এই সরে আসার পিছনে কি কারণ তা তিনি পরিষ্কার ভাষায় ব্যক্ত করেছেন, সে কথাও আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি। মনোমোহন বসুর এই প্রাচ্যরীতি সে কালে যে প্রশংসিত হয়েছিল তার প্রমাণ আমরা পাই সেকালের 'বান্ধব' পত্রিকার একটি লেখা থেকে। সেখানে লেখা হয়েছিল, "এ দেশের নাট্যকারগণ

দুই শ্রেণীতে বিভাজিত। এক শ্রেণীর নাম ইংরাজীনবিশ। আর এক শ্রেণীর নাম বাংলানবিশ। বাংলানবিশদের মধ্যে মনোমোহন বাবুই সর্বশ্রেষ্ঠ, এবং আমরা এই জন্য বহুদিন হইতেই ইহার গুণ পক্ষপাতী।''[৬]

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাট্য রচনার মূলত দু'টি ধারা। এক. ঐতিহাসিক, দুই. অনুবাদ। এছাড়া তিনি প্রহসন ও গীতিনাটক রচনা করেছেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নাটক প্রসঙ্গে অজিতকুমার ঘোষ মন্তব্য করেছেন, ''মাইকেল মধুসূদনের 'কৃষ্ণকুমারী নাটক' ঐতিহাসিক নাটক সমুহের পথ প্রদর্শণ করিয়াছিল, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ নাটকের মধ্যে যে স্বাদেশিক ভাবোদ্দীপনা জাগাইয়া তুলিলেন, তাহা সম্পূর্ণ নূতন ও অদৃষ্টপূর্ব।''[৭] এই 'স্বাদেশিক ভাবোদ্দীপনা'র পিছনে 'হিন্দুমেলা'র (১৮৬৭) ভূমিকার কথা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাঁর জীবনস্মৃতিতে উল্লেখ করেছেন, ''হিন্দুমেলার পর হইতে কেবলই আমার মনে হইত—কি উপায়ে দেশের প্রতি লোকের অনুরাগ ও স্বদেশ প্রীতি উদ্বোধিত হইতে পারে। শেষে স্থির করিলাম, নাটকে ঐতিহাসিক বীরত্বগাথা ভারতের গৌরব কাহিনী কীর্তন করিলে, হয়তো কতকটা উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে।''[৮] এই উদ্দেশ্য সফল করার জন্য ঐতিহাসিক উপাদান নিয়ে নাটক রচনা করার সময় নিজের মতো করে তিনি তা প্রয়োগ করেছেন। এ কারণেই শ্রী আশুতোষ ভট্টাচার্যকে মন্তব্য করতে হয়েছে— ''তাঁহার ঐতিহাসিক নাটকগুলি একটি আধুনিক ভাব প্রকাশেরই বাহন হইয়াছে মাত্র, বস্তুনিষ্ঠা এবং ঐতিহাসিক তথ্য পরিবেশনের দিক দিয়া ইহাদের প্রায় কোন মূল্যই নাই।''[৯] বাংলা নাট্যসাহিত্যে অমৃতলাল বসুর পরিচয় 'রসরাজ' হিসাবে। প্রহসন রচয়িতা রূপে পরিচিতি লাভ করলেও তিনি সমসাময়িক ঘটনা অবলম্বনে নাটক রচনা করেছেন (হীরকচূর্ণ নাটক - ১৮৭৫)। এছাড়া সামাজিক বিষয় ('তরুবালা' - ১৮৯১, 'খাস-দখল - ১৯১২) এবং পৌরাণিক বিষয় ('যাজ্ঞসেনী' - ১৯২৮) নিয়েও তিনি নাটক রচনা করেছেন। ''অমৃতলাল বসু ঐতিহাসিক নাটক রচনার প্রয়াস কখনও করেন নাই।''[১০] বরং 'তিল তর্পন' (১৮৮১) নাটকে ইতিহাসের উপাদান নিয়ে নাটক লেখাকে তিনি ব্যঙ্গ করেছেন। ড: অরুণকুমার মিত্র লিখেছেন —

> বালক বয়স হইতেই অমৃতলালের মনোভাব শ্লেষাত্মক হইয়া উঠিয়াছিল। মধূসূদনের 'একেই কি বলে সভ্যতা'র অনুকরণে তৎকালেই তিনি রচনা করিয়াছিলেন 'একেই কি বলে তোমাদের বাঙ্গালা সাহিত্যের উন্নতি করা?' বিশ বৎসর পূর্ণ হইবার পূর্বেই 'মডেল স্কুল' প্রহসন রচনা করিয়া স্যার জন ক্যাম্বেলের শিক্ষা-পরিকল্পনাকেও করিয়াছিলেন বিদ্রূপ।[১১]

এই সময়ের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য নাট্যকার হলেন গিরিশচন্দ্র ঘোষ। তিনি বাংলা সাহিত্যের যে দুটি ধারা সে সময় প্রচলিত ছিল সেই দুটি ধারার মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করেছিলেন। এ প্রসঙ্গে

শ্রী আশুতোষ ভট্টাচার্য মন্তব্য করেছেন—

> গিরিশচন্দ্রের যখন আবির্ভাব হয়, তখনও বাংলা নাট্য সাহিত্যের দুটি ধারা পরস্পর স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া অগ্রসর হইয়া চলিতেছিল— একটি গীতাভিনয়ের ধারা ও অপরটি ইংরাজী নাট্য সাহিত্যের প্রত্যক্ষ প্রভাব সৃষ্ট বাংলা নাটকের ধারা। পাশ্চাত্ত্য আদর্শে উদ্বুদ্ধ মাইকেল-দীনবন্ধু প্রবর্তিত ধারার সঙ্গে মনোমোহন বসু প্রমুখ নাট্যকারগণ প্রবর্তিত 'নূতন যাত্রা' বা গীতাভিনয়ের ধারাটির মধ্যে যোগস্থাপন করাই গিরিশচন্দ্রের জীবনের সর্বপ্রধান কীর্তি।[১২]

গিরিশচন্দ্র নানা শ্রেণীর নাটক রচনা করেছেন। এর মধ্যে রয়েছে গীতিনাট্য, পৌরাণিক নাটক, সামাজিক নাটক ও ঐতিহাসিক নাটক। ঐতিহাসিক নাটক রচনা প্রসঙ্গে সুকুমার সেন মন্তব্য করেছেন — " "ঐতিহাসিক নাটক" রচনায় ব্যর্থকাম হইয়া গিরিশচন্দ্র রাজকৃষ্ণ রায়ের অনুসরণে পৌরাণিক নাটক রচনায় হাত দিলেন।" [১৩] প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যেতে পারে যে গিরিশচন্দ্র ১৮৮৪ সালে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের (১৮৩৬ - ৮৬) সংস্পর্শে আসেন। পরমহংসদেবের সান্নিধ্য লাভের পর থেকেই মূলত গিরিশচন্দ্রের ভক্তিরসাশ্রিত নাটক রচনার সূচনা। ১৮৮৪ সালের পর রচিত নাটক গুলিতে রামকৃষ্ণের জীবনবাণীর প্রভাব প্রত্যক্ষ করা যায়।

রাজকৃষ্ণ রায় প্রচুর নাটক রচনা করেছিলেন। তাঁর রচনার ধারা মনোমোহন বসু প্রবর্তিত গীতাভিনয়ের ধারাকেই অনুসরণ করেছে। কিন্তু রাজকৃষ্ণ রায়ের নাটক রচনা পৌরাণিক নাটক রচনাতেই স্ফূর্তি লাভ করেছে। এ প্রসঙ্গে অজিতকুমার ঘোষের মন্তব্য উদ্ধোরযোগ্য, "তিনি নানা ধরনের নাটক লিখলেও পৌরাণিক ও ভক্তিমূলক নাটকেই তাঁহার স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত হইয়া রহিয়াছে। রামায়ণ, মহাভারত এবং পুরাণের প্র চলিত কাহিনী অবলম্বন করিয়াই তিনি অধিকাংশ নাটক রচনা করিয়াছিলেন।"[১৪]

বিষয়বস্তু অনুসারে এই পর্বের (১৮৮১ - ১৮৯০) নাটকগুলির যে শ্রেণীবিন্যাস করা হয়েছে এখন সেই বিন্যাস অনুসারে নাটকগুলির আলোচনা করা যেতে পারে। এই আলোচনায় উঠে আসবে নাটকগুলির বিষয়বস্তুগত দিক ও আঙ্গিকগত দিক এবং এরই মধ্য দিয়ে পরিষ্কার হয়ে যাবে রবীন্দ্রনাটকের সঙ্গে অন্যান্য নাটকের সাদৃশ্য ও বৈশাদৃশ্য।

ক. পৌরাণিক নাটক

'পার্থ পরাজয় নাটক'[১৫] (১৮৮১) - মনোমোহন বসু। পাঁচ অঙ্কের এই গদ্য নাটকটির নাম ছাপা হয়েছে এভাবে - 'পার্থ পরাজয় অর্থাৎ বভ্রুবাহনের যুদ্ধে অর্জ্জুনের পরাভব'। অর্জুনের অশ্বমেধের ঘোড়া বন্দী করেছিল চিত্রাঙ্গদার পুত্র বভ্রুবাহন। চিত্রাঙ্গদার অদেশে বভ্রুবাহন অর্জুনের কাছে নিজ পরিচয় দিয়ে ঘোড়া ফিরিয়ে দিতে গেলে অর্জুন তাকে অপমান করে এবং বভ্রুবাহনকে নিজপুত্র ও চিত্রাঙ্গদার সঙ্গে তার সম্পর্ককে অস্বীকার করে। এর ফলে অর্জুনের সঙ্গে বভ্রুবাহনের যুদ্ধ হয় এবং যুদ্ধে অর্জুন পরাজয় বরণ করে। শেষে পিতা-পুত্রের মিলন হয়। এই কাহিনী নির্মাণের ক্ষেত্রে দৃশ্যপট হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে মহাবন, প্রমীলা নগরী-উপবন, প্রমীলাপুরী-প্রমোদবন, বৃষ্ণদেশ, নগরের প্রান্ত, মণিপুর রাজন্ত:পুরী, মণিপুর-প্রান্তর, মণিপুর- পর্ব্বতোপরি অম্বিকার মন্দির, মণিপুর নগর, নগর বাহিরে ক্ষুদ্র পর্ব্বত—অপর দিগে বন, উপত্যকাভূমি, পর্ব্বতের পাদদেশ, হস্তিনাপুরী-কুন্তীদেবীর গৃহ, মণিপুর-রণস্থল। পৌরাণিক বিষয়বস্তু নিয়ে লেখা 'পার্থ পরাজয়'-এ নাট্যকার মনোমোহন বসু কাহিনী বিন্যাসের ক্ষেত্রে কোন বিশেষ তাৎপর্য সৃষ্টি করতে পারেননি। নাটকে সঙ্গীতের প্রয়োগ রয়েছে। পুরাণাশ্রিত এই নাটকটি অবশ্য সাধারণ পৌরাণিক নাটকের মতো ভক্তিমূলক নয়।

'রামের বনবাস'[১৬] (১৮৮২) — রাজকৃষ্ণ রায়। 'রামের বনবাস' [পৌরাণিক ইতিবৃত্ত মূলক নাটক] পদ্যে লেখা পাঁচ অঙ্কের নাটক। রামায়ণের কাহিনী অবলম্বনে লেখা এই নাটকটিতে কাহিনীগত দিক থেকে কোন বিশেষ মাত্রা যোগ হয়নি। দৃশ্যপট হিসেবে উঠে এসেছে রাজসভা, রাজপথ, রাজ্যোদান, সরযূতট, কক্ষ, মানস-সরোবর, রাজপ্রাসাদের ছাদ, রাজপ্রাসাদের সম্মুখ, রাজান্তঃপুরস্থ প্রাঙ্গণ, উপবন, গঙ্গাতট পার্শ্বে নিবিড় অরণ্য। নাটকটিতে সঙ্গীতের প্রয়োগ রয়েছে। ১ম, ২য়, ৩য় এইভাবে প্রজা, ভৃত্য ও রমণী চরিত্রের উল্লেখ আছে। 'রাজপথ'-এর দৃশ্য আছে দু'টি। প্রথম অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্য 'রাজপথ'। রামচন্দ্র রাজা হবেন পথে এই সংবাদ প্রচার করা হচ্ছে। এখানে কয়েকজন ভৃত্য নিজেদের মধ্যে আলাপ করছে যে রামচন্দ্র রাজা হলে তারা কে কি নেবে। যেমন—

১ম ভৃত্য। ... তুই কি নিবি?
২য় ,, । — টাকার তোড়া।
১ম ,, । — হুঁ ! আচ্ছা, তুই কি নিবি?
৩য় ,, । — শালের জোড়া।

১ম „ ।— বারে আরে এয়ার ছোঁড়া!

ভাল, ভাই, তুই কি নিবি?

৪র্থ „ ।— মোটা মোটা টাট্টু ঘোড়া।

দ্বিতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্যটিও 'রাজপথ'। এই দৃশ্যে বাদ্য করতে করতে 'বাদ্যকারগণ' ও আনন্দ করতে করতে 'নাগরিকগণ' প্রবেশ করছে। রামচন্দ্র রাজা হবেন তারই জন্য এই আনন্দ-আয়োজন। এখানে মন্থরার সঙ্গে ভৃত্যদের কথোপকথনে সাধারণ মানুষের রঙ্গপ্রিয়তা প্রকাশ পেয়েছে—

মন্থরা ।— ওরে ও মিন্সে গুলো এগুনো কি?

১ম ভৃত্য ।— কিছু না — কিছু না।

মন্থরা ।— আমি কি কানা?

বল বলচি, দেখা বস্তা খুলে,

নৈলে গাল দেব বাপ তুলে।

২য় ভৃত্য ।— কুঁজ ভাঙবো এক কিলে।

'সীতার বনবাস'[১৭] (১৮৮২) —গিরিশচন্দ্র ঘোষ। 'সীতার বনবাস' [পৌরাণিক দৃশ্যকাব্য] চার অঙ্কের নাটক। রামায়ণের কাহিনী অবলম্বনে লেখা। কাহিনীতে কোন বিশেষত্ব নেই। সঙ্গীতের প্রয়োগ রয়েছে। দৃশ্যপট হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে রাজসভা, অশোক-কানন, নদীর তীর, বাল্মীকির আশ্রম সংলগ্ন কুটীর, তপোবন, প্রান্তর, রণস্থল (বন), যজ্ঞস্থল।

'বৃষকেতু'[১৮] (১৮৮৪) —গিরিশচন্দ্র ঘোষ। এক অঙ্কের এই নাটকটির সংলাপ নির্মাণ হয়েছে গদ্যে ও পদ্যে। সঙ্গীতের প্রয়োগ রয়েছে। প্রচলিত দাতাকর্ণের কাহিনী অবলম্বনে রচিত। ডঃ দেবীপদ ভট্টাচার্যের মতে "নাটকটি বিশেষত্বহীন"।[১৯] দৃশ্যপট হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে রাজসভা ও রাজপথ। তৃতীয় গর্ভাঙ্ক 'রাজপথ'। পথে নানাশ্রেণীর মানুষের চলাচল। রাস্তার চলমানতার প্রকাশ রয়েছে এই দৃশ্যে, কিন্তু তাঁর নাটকে পথ রবীন্দ্রনাটকের মতো কখনই প্রতীক হয়ে দেখা দেয় নি।

'যদুবংশ ধ্বংস'[২০] (১৮৮৪)—রাজকৃষ্ণ রায়। 'যদুবংশ ধ্বংস' [পৌরাণিক ইতিবৃত্ত মূলক নাটক] পাঁচ অঙ্কের নাটক। পদ্যে রচিত নাটকটিতে সঙ্গীতের প্রয়োগ রয়েছে। যদুবংশ ভীষণভাবে বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে কালপুরুষ ভাবছে এই বংশ কি ভাবে ধ্বংস করা যায়। একথা কালপুরুষ কৃষ্ণকে জানায় এবং এও জানায় যে এই বংশ বৃদ্ধির ফলে পৃথিবী পীড়িত হচ্ছে, এর প্রতিকার প্রয়োজন। কৃষ্ণ কালপুরুষের এই কথা স্বীকার করে নেয়। তার মনে হয় এতদিন সে মোহিনীমায়ায় মোহিত ছিল তাই এই সংকট বুঝতে পারে নি।

কালপুরুষের কথায় তার চেতনা হল —

পৃথিবীতে আর না রাখিব যদুকুল;
করিব নির্ম্মূল;
নিরাকুল করিব ধরারে।

এরপর কৃষ্ণ মায়াদেবীকে আদেশ দেয় দ্বারকাকে মায়াশূন্য করবার জন্য। এদিকে কৃষ্ণের মনে পড়ে যায় সতীর অভিশাপের কথা —

কৃষ্ণ তব চক্রের কৌশলে
পুত্রহীনা হ'য়ে কাঁদি আমি,
কিন্তু তুমি শোনো চক্রপাণি,
তব পুত্রপৌত্রগণ সহ
যদু বংশ হইবে নির্ম্মূল;
আত্মীয় বিয়োগ শোক জ্বালা
মোর মত তুমিও ভুঞ্জিবে।

আরেক দিকে কৃষ্ণের পুত্রদের পরিহাস সহ্য করতে না পেরে দুর্ব্বাসা অভিশাপ দেয়—''যদুবংশ- ধ্বংস সুনিশ্চয়''। এর পর কৃষ্ণের লীলায় যদুবংশে একে অপরের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয়। কৃষ্ণের কাছে এ ''অনিবার্য নিয়তির গতি''। নিজেদের মধ্যে এই আত্মঘাতী যুদ্ধে সবাই ধ্বংস হয়ে যায়। যদুবংশের সদস্যদের সৎকারের জন্য অর্জুনকে দায়িত্ব দিয়ে কৃষ্ণ বৈকুণ্ঠ ধামে চলে যায়। এই 'অনিবার্য নিয়তির গতি'র কাছে কৃষ্ণের অসহায়ত্ব প্রকাশ পেয়েছে। নাটকে দৃশ্যপট হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে পর্ব্বত, মায়াপুরী, অরণ্য, রাজপথ, গৃহ, যজ্ঞভূমি, উদ্যান, রাজপ্রাসাদের সম্মুখ, রাজসভা, দেবালয়, প্রভাসতীর্থ, শিবির ও অরণ্যপথ। রাজপথের দৃশ্য আছে ৬টি ও অরণ্যপথের দৃশ্য ১টি। পথ কোন প্রতীকী ব্যঞ্জনায় উদ্ভাসিত না হলেও সাধারণ মানুষের পদসঞ্চালনে এই সব পথদৃশ্য মুখরিত। যেমন - প্রথম অংকের চতুর্থ দৃশ্যে দৃশ্যপট হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে 'রাজপথ'। এই পথে যদুবংশীয় নাগরিকগণ উপস্থিত। দ্বারকা নগরীতে যে অমঙ্গল দেখা দিয়েছে সেই অমঙ্গলের কথাই 'নাগরিকগণ' আলোচনা করছে। দ্বারকা নগরীর এই বিপদের কথা আলোচিত হয়েছে দ্বিতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে। এখানেও দৃশ্যপট 'রাজপথ'। দু'জন রাজভৃত্যের আলোচনায় প্রকাশ পেয়েছে দ্বারকা নগরীর বিপদের কথা। তৃতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্যটি 'রাজপথ'। একজন মৎস্যজীবী তার স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলছে। এই সংলাপে সাধারণ মানুষের রঙ্গপ্রিয়তা প্রকাশ পেয়েছে। উদাহরণ হিসেবে সংলাপের কিছু

অংশ উদ্ধার করা যেতে পারে —

পত্নী । — আমার, মিন্সে, পোড়ার মুখো,
বড় যে দিচ্চিস খোটা?
মারবো মুখে মুড়ো ঝাঁটা।
এই নে তোর মাছের ঝুড়ি,
এই আমি চলনু বাড়ী;
হাটে যদি যাই,
তো তোর মাথা খাই!

মৎস্যজীবী। —দোহাই —দোহাই!
বৌ তোর পায়ে পড়ি, যাসনে বাড়ী,
তুলেনে মাছের ঝুড়ি।

পত্নী । —কোন্ বেটী আর হাটে যা'বে,
কোন্ শালী তোর ভাত বা খা'বে।

মৎস্যজীবী। —ও বাবা! এত রাগ।
মাগী যেন মদ্দা বাঘ!...

'তরণীসেন বধ'[২১] (১৮৮৪) —রাজকৃষ্ণ রায়। 'তরণীসেন বধ' [পৌরাণিক ইতিবৃত্ত মূলক নাটক] পদ্যে লেখা পাঁচ অঙ্কের নাটক। এতে প্রচুর গান রয়েছে। কাহিনী রামায়ণ থেকে গৃহীত। তরণী সেন বিভীষণের পুত্র। বিভীষণ ও তরণী দুজনেই রামভক্ত। সীতা উদ্ধারের সময় তরণী সেনের সঙ্গে রামের যুদ্ধ হয়। তরণী সেন রামের শরাঘাতে মৃত্যুবরণ করার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে। ব্রহ্মার আদেশে মায়াদেবী বিভীষণের অন্তর থেকে পুত্র স্নেহ হরণ করে নেয়। রাম প্রথমে দ্বিধাগ্রস্থ থাকলেও পরে তরণী সেনকে বধ করে। কাহিনীর মধ্যে কোন বিশেষত্ব নেই। দৃশ্যপট হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে সমুদ্র, কক্ষ, অশোকবন, উদ্যান, অরণ্য, শিবমন্দির, রাজসভা, দুর্গসম্মুখ, রাজপ্রাসাদ-সম্মুখ, সমুদ্র তটে শিবির, যুদ্ধক্ষেত্র।

'নল-দময়ন্তী'[২২] (১৮৮৭)—গিরিশচন্দ্র ঘোষ। 'নল-দময়ন্তী' [পৌরাণিক নাটক] পদ্যে লেখা চার অঙ্কের নাটক। সংগীতের প্রয়োগ রয়েছে। বিদূষকের সংলাপে কখনো কখনো এসেছে গদ্যভাষা। যেমন —

মহাশয়, না হয় একটু হাসলেন, — না হয় দু'দন্ড লোকালয়ে বসলেন; —

মনের কপাট না হয় খানিক খুল্লেন। বলি, মহাশয়, হাসতে কি দিব্যি দেওয়া আছে? (দ্বিতীয় অঙ্ক/ প্রথম গর্ভাঙ্ক)

নল-দময়ন্তীর আখ্যান ব্যাসদেব রচিত মহাভারতের বনপর্বে বিবৃত হয়েছে। নল (নিষধরাজ) বিদর্ভ রাজকন্যা দময়ন্তীর প্রতি অনুরক্ত হয়ে পড়ে। কিন্তু অন্যদিকে ইন্দ্র, অগ্নি, বরুণ, যম, কলি সবাই দময়ন্তীর প্রতি অনুরক্ত। তারা সয়ম্বর সভায় নলকে যোগ দিতে নিষেধ করে। কিন্তু নল তাদের কথা না শুনে সয়ম্বর সভায় যোগ দেয়। এদিকে অন্য সবাই নলের ছদ্মবেশ ধারণ করে সয়ম্বর সভায় উপস্থিত হয়। কিন্তু দমনয়ন্তী আসল নলকে চিনতে পারে এবং তার গলায় মালা পরায়। ইন্দ্র, অগ্নি, বরুণ, এবং যম নলকে বর প্রদান করে। কিন্তু কলি এর প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য মায়াজাল সৃষ্টি ক'রে নলের ভাই পুষ্করের সঙ্গে নলের পাশা খেলার আয়োজন করে। খেলায় নল তার রাজ্য হারায় এবং দময়ন্তী সহ রাজ্য থেকে বিতাড়িত হয়। কলির তবুও মন ভরে না, একসময় ছলনার মাধ্যমে নলকে দময়ন্তীর কাছ থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। শেষ পর্যন্ত অনেক বিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে নল ও দময়ন্তী পুনরায় মিলিত হয় এবং নল তার রাজ্য ফিরে পায়।

'নল-দময়ন্তী' প্রসঙ্গে শ্রী দেবীপদ ভট্টাচার্য জানিয়েছেন—

> গিরিশচন্দ্রের বহু পূর্ব থেকে 'নল-দময়ন্তী' যাত্রা পালার প্রচলন ছিল। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত লিখেছেন: কালিয় দমন, বিদ্যাসুন্দর, নলোপাখ্যান প্রভৃতি যাত্রার আমোদ আছে কিন্তু তত্ত্বাবৎ অত্যন্ত ঘৃণিত উপায়ে সম্পন্ন হইয়া থাকে তাহাতে আমোদ-প্রমত্ত ইতরলোক ব্যতীত ভদ্রসমাজের কদাপি সন্তোষ বিধান হয় না। [সংবাদ প্রভাকর; ২৮ জুন, ১৮৪৮] এর থেকে বোঝা যায় 'নলোপাখ্যান' যাত্রা নিম্নরুচির ছিল।... গিরিশচন্দ্রের নাটক নলবৃত্তান্ত-ধারার শ্রেষ্ঠ নাটক।"[২৬]

এই নাটকে দৃশ্যপট হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে উপবন, প্রাঙ্গন, কক্ষ, রাজপথ, নগর-প্রান্তর, কানন, বন ও রাজবাটীর সম্মুখ। এই নাটকের দ্বিতীয় অঙ্ক, চতুর্থ গর্ভাঙ্কে দৃশ্যপট হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে 'রাজপথ'। নল রাজ্যচ্যুত হওয়ার পর বিদূষক নলের জন্য খাবার নিয়ে যাওয়ার সময় এই পথে রক্ষীদের হাতে ধরা পড়ে। তৃতীয় অঙ্ক, পঞ্চম গর্ভাঙ্কে দৃশ্যপটটি 'চেদিনগর রাজবাটীর সম্মুখ'। রাজবাটীর সম্মুখ কারণেই দৃশ্যটি পথে সংঘটিত হচ্ছে ধরে নেওয়া যেতে পারে। এই দৃশ্যে প্রথমে দেখা যায় দময়ন্তী উন্মাদিনী হয়ে স্বামীকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। রাজমাতা প্রাসাদের উপর থেকে দময়ন্তীকে দেখাত পেয়ে তাকে প্রাসাদে ডেকে নিয়ে যান। এর কিছুক্ষণ পর দেখা যায় বিদূষকে। বিদূষক কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে নল রাজাকে খুঁজতে খুঁজতে চেদিনগরের এই রাজবাটীর সম্মুখে চলে এসেছে। এই দৃশ্যে সাধারণ মানুষের উপস্থিতি রয়েছে।

এই সাধারণ মানুষের প্রকৃতি রবীন্দ্রনাটকের সাধারণ মানুষের কাছাকাছি।

'দক্ষ-যজ্ঞ'[২৪] (১৮৮৯) —গিরিশচন্দ্র ঘোষ। 'দক্ষ-যজ্ঞ' [পৌরাণিক নাটক] পদ্যে লেখা চার অঙ্কের নাটক। শ্রী দেবীপদ ভট্টাচার্য এর কাহিনী প্রসঙ্গে লিখেছেন, '' 'শিবপুরাণ' বা 'দেবীভাগবত' থেকে গিরিশচন্দ্র 'দক্ষ-যজ্ঞ' নাটকের আখ্যান গ্রহণ করেছেন।''[২৫] আবার আশুতোষ ভট্টাচার্য এ প্রসঙ্গে পোষণ করেছেন ভিন্নমত। তাঁর মতে, ''এই কাহিনী রচনায় গিরিশচন্দ্র বিশেষ কোন পুরাণকে অবলম্বন করিবার পরিবর্তে প্রচলিত কথকতাকে অবলম্বন করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়।''[২৬] যেখান থেকেই কাহিনী গ্রহণ করা হোক না কেন এই নাটকের কাহিনীতে কোন বিশেষত্ব প্রকাশ পায় নি। দৃশ্যপট হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে - কানন, উদ্যান, কক্ষ, উদ্যানস্থ বিল্বমূল, কৈলাসপুরী। নাটকটিতে সঙ্গীতের প্রয়োগ আছে।

খ. **প্রহসন**

'তিল তর্পণ নাটক'[২৭] (১৮৮১)—অমৃতলাল বসু। 'তিল তর্পণ' দুই অঙ্কের ছোট নাটক। গদ্যে লেখা এই প্রহসনটিতে গানের প্রয়োগ আছে। নাটকের শুরুতে 'পূর্বদৃশ্য' রয়েছে। 'পূর্বদৃশ্য - নাটকশালা'। এই দৃশ্যে দেখা যাচ্ছে একটি অপেরা দলের ম্যানেজার, অপেরা মাস্টার এবং কয়েকজন অভিনেতা মিলে একটি নাটক অভিনয়ের পরিকল্পনা করছে। এই পরিকল্পনার সময় সেখানে একজন নাট্যকার উপস্থিত হয়ে তার লেখা 'তিল তর্পণ' নাটকটি অভিনয় করার জন্য অনুরোধ করে। সকলে তার প্রস্তাবে রাজী হয়ে 'তিল তর্পণ' অভিনয় করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ঐতিহাসিক নাটককে ব্যঙ্গ করে এই প্রহসনের কাহিনী নির্মাণ করা হয়েছে। চিতোরের রাজা বাপ্পা রাও-এর কণ্যা হিমাঙ্গিনী একজন মালীর প্রেমে পড়ে এবং বাড়ি থেকে পালিয়ে যায়। এদিকে বাংলার নবাব আলিবর্দি খাঁ চিতোর আক্রমণ করতে এসেছে। হিমাঙ্গিনী ও মালী পালিয়ে গিয়ে আলিবর্দি খাঁর শিবিরে আশ্রয় নেয়। শেষে স্বর্গ থেকে নারদ এসে কণ্যাহারা বাপ্পা রাওকে এই বলে সান্ত্বনা দেয় যে, মালী একজন শাপভ্রষ্ট রাজপুত্র। ড: অরুণকুমার মিত্র এই নাটকটি সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন—

> তৎকালীন ঐতিহাসিক নাটকের কালাতিক্রমণকেই শুধু ব্যঙ্গ করিয়া অমৃতলাল ক্ষান্ত হন নাই। ইতিহাসকে পুরাণের পথে টানিয়া সহসা নারদের শেষ উক্তিতে তাহাকে রূপকথায় পরিণত করিয়া তিনি ঐতিহাসিক নাট্য রচয়িতাদের যথেচ্ছ কল্পনার প্রতি চরম বিদ্রূপ বর্ষণ করিয়াছেন।[২৮]

শেরিডানের 'দি ক্রিটিক' থেকে গৃহীত 'তিল তর্পন'-এর কাহিনী নির্মাণে দৃশ্যপট হিসাবে দেখা দিয়েছে রাজ-অন্তপুর, রাজবাটীর সংলগ্ন উদ্যান, চিতোরের গড়ের মাঠ, শিবির, রঙ্গমঞ্চ (ক্রোড়াঙ্ক) ও রাজবাটী।

'চাটুজ্যে ও বাঁড়ুজ্যে' (১৮৮৪)—অমৃতলাল বসু। 'Cox and Box' এবং 'Box and Cox' নামক দুটি ইংরেজী প্রহসন অবলম্বনে 'চাটুজ্যে ও বাঁড়ুজ্যে' রচিত। একটি মাত্র দৃশ্যের এই প্রহসনটিতে কোন গান নেই। এর কাহিনী হচ্ছে চাটুজ্যে ও বাঁড়ুজ্যে একই ঘর ভাড়া নেবার পর দু'জনের মধ্যে বিবাদ শুরু হয়। জানা যায় বাঁড়ুজ্যের পরিত্যাক্তা পাত্রী দিগম্বরীকে বিয়ে করছে চাটুজ্যে। এই নিয়ে দু'জনের মধ্যে বিরোধ। বাঁড়ুজ্যে প্রমাণ করতে চায় চাটুজ্যে দিগম্বরীর পাত্র, আবার অন্যদিকে চাটুজ্যে প্রমাণ করতে চায় বাঁড়ুজ্যে দিগম্বরীর পাত্র। এই জটিলতার মাঝে দু'জনেই দিগম্বরীকে পরিত্যাগ করতে চায়। শেষে যখন জানা গেল দিগম্বরীর অন্য জায়গায় বিয়ে ঠিক হয়েছে তখন দু'জনেই এই সংকট থেকে মুক্তি পেল এবং দু'জনের মধ্যে বন্ধুত্ব স্থাপিত হল।

'বিবাহ বিভ্রাট'[২৯] (১৮৮৪) —অমৃতলাল বসু। 'বিবাহ বিভ্রাট' (সামাজিক নাট্যলীলা, A society comedieta, In two Acts, ১২৯১ সালে স্টার থিয়েটারে অভিনীত।) গদ্যে লেখা দুই অঙ্কের প্রহসন। গানের সংখ্যা কম। সে সময়কার যৌতুক প্রথা এবং নব্য সাহেবিআনাকে কশাঘাত করা হয়েছে এই প্রহসনে। গোপীনাথ সরকারের ছেলে নন্দলাল সরকার লেখাপড়া শিখে সাহেবিআনা ধরেছে। গোপীনাথ অনেক টাকা যৌতুকের বিনিময়ে ছেলের বিয়ে ঠিক করেছে। যৌতুকের সম্পূর্ণ টাকা নিয়ে ছেলে বিয়ের রাতে বাসর ঘর থেকে পালিয়ে যায়। ছেলের বাসনা বিলেতে গিয়ে লেখাপড়া শিখবে। এই হচ্ছে 'বিবাহ-বিভ্রাট'-এর কাহিনী। এই প্রহসনটি সম্পর্কে ড: অরুণকুমার মিত্র মন্তব্য করেছেন—

> ১৮৮৪ সনে মধ্যবিত্ত বাঙালী সমাজের কয়েকটি বাস্তব সমস্যাকে জ্বলন্ত নাট্যরূপ দিলেন অমৃতলাল তাঁহার অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রহসন 'বিবাহ বিভ্রাটে'।... মধ্যবিত্ত বাঙালী সমাজে বরপণের নৃশংস বর্বরতা, বেপরোয়া স্ত্রী-স্বাধীনতা এবং জাতীয়তা বিসর্জন দিয়া সাহেব সাজিবার উৎকট আগ্রহ এখানে নির্মম ব্যঙ্গে কশাঘাত হইয়াছে।[৩০]

'বিবাহ বিভ্রাট' প্রহসনটি সে সময় ভীষণ জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। এ প্রসঙ্গে 'বঙ্গবাসী' পত্রিকার যোগেশচন্দ্র বসুর একটি লেখার কথা উল্লেখ করেছেন ড: অরুণকুমার মিত্র। আমরা সেখান থেকে উদ্ধৃত করছি—" 'বিবাহ-বিভ্রাটে'র তুলনা নাই, ইহার দাম হওয়া উচিত এক আনা, আর 'ধারাপাত' 'বর্ণপরিচয়ে'র মত বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে ইহার অবাধ প্রবেশ থাকা একান্ত আবশ্যক।"[৩১]

'হঠাৎ নবাব'[৩২] (১৮৮৪)—জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর। এই প্রহসনটির শুরুতেই উল্লেখ করা হয়েছে, ''প্রসিদ্ধ ফরাসী প্রহসন-কার মলিয়ের প্রণীত 'লে বুর্জোয়া জাঁতিয়ম' নামক প্রহসন হইতে শ্রী জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক নামান্তরিত স্বাধীন অনুবাদ।'' গদ্যে লেখা পাঁচ অঙ্কের প্রহসনটিতে সঙ্গীতের প্রয়োগ রয়েছে। জুর্দ্দন খাঁ একজন অশিক্ষিত লোক। হঠাৎ করে সে বড়লোক হয়ে যায়। একজন অশিক্ষিত লোকের হঠাৎ বড়লোক হওয়ার বিড়ম্বনা নিয়ে এই প্রহসনের কাহিনী নির্মাণ হয়েছে।

এই প্রহসনটিতে কোন দৃশ্যপটের উল্লেখ নেই। কিছু কিছু দৃশ্য একেবারেই ছোট, শুধুমাত্র দু'একটি সংলাপ রয়েছে। যেমন ২য় অঙ্ক-২য় দৃশ্য, ২য় অঙ্ক-৫ম দৃশ্য। এছাড়া ২য় অঙ্কের ১০ম দৃশ্যে কোন সংলাপ নেই, শুধু উল্লেখ করা হয়েছে —

(নৃত্যকারীগণের দ্বিতীয়বার প্রবেশ)

(চারিজন কারিকর নাচিতে নাচিতে জুর্দ্দনের জয় জয়াকার করিতে লাগিল)।

মলিয়ের থেকে 'হঠাৎ নবাব' অনুবাদ প্রসঙ্গে অজিতকুমার ঘোষ লিখেছেন—''অনুবাদ অবিকল ভাবে মূল নাটকের অনুসরণ করিয়াছে, সে জন্য একমাত্র ভাষা ব্যতীত জ্যোতিরিন্দ্রনাথের মৌলিকতা কিছুই নাই।''[৩৩] মলিয়েরের (Jean Baptiste poquelin) 'বুর্জোয়া জাঁতিয়ম' (Le Bourgeois gentihomme - 1670) অনুবাদের মাধ্যমেই জ্যোতিরিন্দ্রনাথের অনুবাদ জগতে পদচারণা শুরু হয়। 'হঠাৎ নবাব'-এর বিষয়বস্তু স্মরণ করিয়ে দেয় উনবিংশ শতাব্দীর নব্যবাবুয়ানাকে।

'বেল্লিক বাজার'[৩৪] (১৮৮৭)—গিরিশচন্দ্র ঘোষ। 'বেল্লিক বাজার' [বড় দিনের পঞ্চরং] আটটি দৃশ্যের গদ্যে লেখা প্রহসন। এই প্রহসনটিতে নব্যবাবুয়ানা ও ইংরেজদের প্রতি কটাক্ষ করা হয়েছে। প্রহসনটি সম্পর্কে শ্রী দেবীপদ ভট্টাচার্য লিখেছেন—

> প্রতিবছর বড়দিনের সময় এই ধরণের 'পঞ্চরং' গিরিশচন্দ্রকে লিখতে হত। 'বড়দিনের বখশিশ', 'পাঁচ কনে' প্রভৃতি নকশাগুলি তার দৃষ্টান্ত। এটি উঁচু দরের প্রহসন নয়, মধুসূদন বা দীনবন্ধুর মতো ব্যঙ্গ সৃষ্টির প্রতিভা গিরিশচন্দ্রের ছিল না। সাধারণ দর্শকদের রুচি তৃপ্তিকারী রঙ্গরসের নাটক।... রচনাটি বিদ্রূপাত্মক নকশাধর্মী ঈষৎ 'হুতোম' প্রভাবিত।... পূর্বের যাত্রার কালুয়া-ভুলুয়া, মেথর-মেথরানীর সঙের অনুসরণ বেল্লিক বাজারে আছে।[৩৫]

দৃশ্যপট হিসেবে প্রহসনটিতে ব্যবহৃত হয়েছে, নিমতলার ঘাট, কক্ষ, রঙ্গপট, উঠান, রাজপথ ও উদ্যান - মধ্যস্থ কক্ষ। সপ্তম দৃশ্যটি 'রাজপথ'। এই দৃশ্যে দেখা যাচ্ছে বড়দিনের উৎসব করতে পথে বেরিয়েছে মানুষ।

'দাদা ও আমি'[৩৬] (১৮৮৮) — উপেন্দ্রনাথ দাস। 'দাদা ও আমি'র বিজ্ঞাপনে পাঠকদের উদ্দেশ্যে লেখা হয়েছে—

> "প্রহসন" স্বরূপে কল্পিত ও আরব্ধ হয়। যাহা দাঁড়াইয়াছে, তাহাতেও এমন কিছুই নাই "বিকাল বেলার জল খাবার" বলিলেও অত্যুক্তি হইবে কিনা, জানি না। ইহা পাঠে বা দর্শনে আপনার ওষ্ঠ প্রান্তে যদি একবার মাত্রও স্মিতের রেখা মাত্রও উদিত হয়, অন্তরের সহিত আহ্লাদিত হইব।

উপেন্দ্রনাথ ইংল্যান্ডে থাকার সময় 'ব্রাদার জিল অ্যান্ড আই' প্রহসন অবলম্বনে 'দাদা ও আমি' রচনা করেন। ধীরেন্দ্রকুমার ও অনন্তকুমার দুই ভাই-এর মধ্যে বন্ধুত্বের সম্পর্ক। এই দু'জনের বিয়ের বিষয় নিয়ে 'দাদা ও আমি' প্রহসনটির কাহিনী নির্মাণ হয়েছে। এতে শুধুই হাস্যরস পরিবেশন করা হয়েছে।

'তাজ্জব ব্যাপার'[৩৭] (১৮৯০) —অমৃতলাল বসু। 'তাজ্জব ব্যাপার' (হাস্যরসোদ্দীপক সাময়িক গীতিরঙ্গ) সাতটি দৃশ্যে গদ্যে লেখা প্রহসন। সঙ্গীতের প্রয়োগ আছে। শুরুতেই প্রস্তবনা অংশে বঙ্গনারীগণ গান গাইছে - "ফটকে আটক রবনা/ আপন করে যতন করে খুলে দেছ ডানা।" নারী স্বাধীনতাকে ব্যঙ্গ করে এই প্রহসনটির কাহিনী গড়ে উঠেছে। দৃশ্যপট হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে - বিবাহ সভা, দরদালান, ছাঁদনা তলা, রাস্তা, সভাগৃহ, গড়ের মাঠ। চতুর্থ দৃশ্য 'রাস্তা'। এই রাস্তায় বিভিন্ন মানুষের চলাচল। যেমন রাস্তায় রয়েছে কয়েকজন স্ত্রীলোক, দু'জন উড়ে, কয়েকজন পাণ্ডা ও সাধারণ মানুষ।

গ. গীতাভিনয়

গীতাভিনয়ের সূচনা করেছিলেন মনোমোহন বসু একথা আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি এবং মনোমোহন বসুর গীতাভিনয় রচনার পিছনে কিসের প্রেরণা কাজ করেছিল সে কথাও আমরা উল্লেখ করেছি। গিরিশচন্দ্র ঘোষ এই গীতাভিনয়ের ধারায় কয়েকটি গীতিনাট্য রচনা করেছিলেন। শ্রী দেবীপদ ভট্টাচার্য গিরিশচন্দ্রের গীতিনাট্য রচনার পিছনে Dramatic Performances Control Bill-এর ভূমিকা রয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন। তাঁর এই মন্তব্যটি উদ্ধার যোগ্য—

> ১৮৭৬ সালের 'গজদানন্দ' অভিনয়ের অপ্রীতিকর ঘটনা ও গ্রেফতার পর্বের পর গভর্নমেন্ট নাট্যনিয়ন্ত্রণ বিল পাশ করার চেষ্টা করেন ও একটি সিলেক্ট কমিটি গঠন করেন। ঐ সিলেক্ট কমিটি বিলটির সমর্থনে মত প্রকাশ করেন।

> ১৮৭৬ সালের ২৫ মার্চ তারিখে বিলটি 'ইন্ডিয়া গেজেটে' প্রকাশিত হয়। নানা প্রতিবাদ পত্র প্রেরণ সত্ত্বেও গভর্নর জেনারেল ১৮৭৬ সালের ১৭ ডিসেম্বর তারিখে Dramatic Performances Control Bill পাশে সম্মতি দান করেন। পুলিশের অনুমতির প্রয়োজন বোধে মৌলিক নাট্য রচনার উৎসাহ কমে গিয়েছিল। 'গীতিনাট্য' ধরনের নাট্য রচনায় কোন ঝুঁকি নেবার কোনো প্রয়োজন ছিল না। সে জন্যই গিরিশচন্দ্র গীতিনাট্য রচনায় হাত দিয়েছিলেন।[৩৮]

গিরিশচন্দ্র ঘোষ ১৮৮১ থেকে ১৮৮৪-এর মধ্যে তিনটি গীতিনাট্য রচনা করেন। 'মায়াতরু' (১৮৮১), 'ব্রজবিহার' (১৮৮৩), 'হীরার ফুল' (১৮৮৪)।[৩৯] এই তিনটি গীতিনাট্যই অভিনীত হয়। 'মায়াতরু' প্রথম অভিনীত হয় ২৫ জুন ১৮৮১, 'ব্রজবিহার' ১লা এপ্রিল ১৮৮২ (গ্রন্থ প্রকাশের এক বছর পূর্বেই নাটকটি অভিনীত হয়েছিল), 'হীরার ফুল' প্রথম অভিনয় ২৬ এপ্রিল ১৮৮৪। গীতিনাট্য রচনায় গিরিশচন্দ্র তেমন দক্ষতার পরিচয় দিতে পারেন নি। কাহিনী বিন্যাসের ক্ষেত্রেও তেমন কোন নতুনত্ব নেই। 'মায়াতরু' তিনটি দৃশ্যের ছোট নাটিকা। গীতিনাট্য হলেও সম্পূর্ণ সংলাপ গদ্যে রচিত হয়েছে। সংলাপের মাঝে মাঝে এসেছে সঙ্গীতের প্রয়োগ। শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা অবলম্বনে 'ব্রজবিহার'-এর কাহিনী নির্মাণ হয়েছে। আশুতোষ ভট্টাচার্য 'ব্রজবিহার'কে '' 'ইতালীয় অপেরা' জাতীয় গীতিনাট্য''[৪০] বলে উল্লেখ করেছেন। একই মন্তব্য করেছেন শ্রী দেবীপদ ভট্টাচার্য ''গীত সর্বস্ব নাটক বা 'অপেরা' খানি 'ইটালিয়ান অপেরার' মতোই।''[৪১] 'হীরার ফুল' এক অঙ্কের গীতিনাট্য। মদন ও রতির কাহিনী নিয়ে এই গীতি নাট্য নির্মাণ হয়েছে। কাহিনীতে কোন বিশেষত্ব নেই।

'আশালতা'[৪২] (১৮৮৮)—রাধানাথ মিত্র। 'আশালতা' তিন অঙ্কের গীতিনাট্য। সংলাপ নির্মাণ হয়েছে পদ্যে। নাটকের শুরুতেই 'প্রস্তাবনা' অংশে দেখা যায় অপ্সরীগণ গান গাইছে ''প্রেম নিকেতন, এ বিশ্ব-ভূবন, /প্রেমিক বিনা কে জানে প্রেম কি অমূল্য ধন... ।'' অপ্সরীগণের এই গান মনে করিয়ে দেয় রবীন্দ্রনাথের 'মায়ার খেলা' গীতিনাট্যের মায়াকুমারীগণের গানকে। 'মায়ার খেলা' গীতিনাট্যটিও শুরু হয়েছে মায়াকুমারী গণের গানের মধ্য দিয়ে। দুটি নাটকের বিষয় বস্তু প্রেম হলেও প্রেমের প্রকাশ রীতিতে দুটি নাটকের দুই প্রান্তে অবস্থান। রুদ্রদ্বীপের অধীশ্বর ভূপতি, কৃষক শিশুপালের পালিত কন্যা প্রতিভা এবং উগ্রদ্বীপাধিপতির পুত্র প্রফুল্লের কাহিনী 'আশালতা'। ভূপতি বিয়ে করতে চায় প্রতিভাকে কিন্তু প্রতিভা ও প্রফুল্ল একে অন্যকে ভালবাসে। এক সময় দেশে যুদ্ধ শুরু হলে প্রফুল্ল ও প্রতিভা গোপনে মিলিত হয়। এই মিলনের কথা শুনে ভূপতি প্রফুল্লকে হত্যার আদেশ দেয়। প্রফুল্লকে হত্যা করতে নিয়ে যাওয়ার সময় দেবী প্রজাপতির আবির্ভাব হয়। প্রজাপতি নির্দেশ দেয় এই হত্যাকান্ড বন্ধ করে প্রতিভার

সঙ্গে প্রফুল্লর বিয়ে দেবার জন্য। ''কারণ যে যাহারে ভালবাসে সে থাকিবে তাহার পাশে, ...'' (৩য় অঙ্ক/ ১ম দৃশ্য)। ভূপতি প্রজাপতির নির্দেশ মেনে নেয়। এরপর প্রজাপতির মুখে প্রফুল্লর পরিচয় জানা যায়। ভূপতির বন্ধু উগ্রদ্বীপাধিপতির একমাত্র পুত্র প্রফুল্ল। প্রফুল্ল বনিকের কন্যা প্রতিভার প্রেমে পড়ে। বনিকের কন্যা কারণেই প্রফুল্লের পিতা এ প্রণয়ে বাধা দেয় এবং প্রতিভাকে দেশান্তরে পাঠিয়ে দেয়। এর ফলে প্রফুল্লও দেশান্তরী হয় এবং শেষ পর্যন্ত প্রফুল্ল ও প্রতিভার মিলন হয়।

বিষয়বস্তুর দিক থেকে রবীন্দ্র-কাহিনীকাব্য গুলির সঙ্গে এক ধরণের সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়। নাটকের শেষ দৃশ্যে পুনরায় 'অপ্সরীগণের' আবির্ভাব হয়। এই অপ্সরীগণের গানের সঙ্গে 'মায়ার খেলা' - এর প্রথম দৃশ্যের মায়াকুমারীগণের গান যেন মিলে যেতে চায়। অপ্সরীগণ গাইছে—

মিলাই প্রেমিক জনে সুসময় হেরিয়ে।
প্রেম-ভরে প্রেম-সরে দেই দোঁহে ডুবায়ে।
রবি সহ কমলিনী
শশী সহ কুমদিনী,
তরু সহ লতিকায় দিই সদা মিলায়ে।
কুসুমের হিয়া খুলে, বসাই মধুপকুলে,
সুরভি সমীর অঙ্গে দিই প্রেমে ঢালিয়ে
নির্ঝরের বারিবিন্দু, ল'য়ে যাই যথা সিন্ধু
অপার প্রেমের নীরে দিই সদা মিলায়ে। (৩য় অঙ্ক/ ২য় দৃশ্য)

মায়াকুমারীগণ অবশ্য মায়াজাল গাঁথার কথা বলছে, ''মোরা জলে স্থলে কতছলে মায়াজাল গাঁথি।'' এই মায়াজাল প্রেমেরই মায়াজাল, দুটি হৃদয়কে বাঁধার মায়াজাল ''নরনারী-হিয়া মোরা বাঁধি মায়াপাশে''। অপ্সরীগণও প্রায় একই কথা বলছে, ''মিলাই প্রেমিক জনে সুসময় হেরিয়ে''। এদিক থেকে বিচার করলে দেখা যাচ্ছে যে দু'টি গানের বক্তব্য যেন মিলে যেতে চায়। লক্ষ করবার বিষয় 'আশালতা' এবং 'মায়ার খেলা'র প্রকাশকাল ১৮৮৮। তবে এই সাদৃশ্যের আভাস দ্বারা প্রমাণের অবকাশ থাকে না যে দু'টি নাটক একই মাত্রাপ্রাপ্ত হয়েছে। 'মায়ারখেলা'র বিষয়বস্তু ভিন্ন মাত্রায় উজ্জ্বল।

'নব-বাসর'[৪৩] (১৮৮৮)—রাধানাথ মিত্র। 'নব-বাসর' [বৈকুণ্ঠ মিলন] তিন অঙ্কের নাটিকা। সংলাপ রচিত হয়েছে পদ্যে। সঙ্গীতের প্রয়োগ রয়েছে। রাধাকৃষ্ণের মিলনের বিষয় নিয়ে এর কাহিনী নির্মাণ হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবন ত্যাগ করে দ্বারকায় চলে গেছে। দ্বারকার রাজা হিসেবে কৃষ্ণের অভিষেক হবে।

এই অভিষেকের দিন বৃন্দাবনবাসী ও রাধার সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের মিলন হয়। রাধার সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের পুনরায় মিলন হয় বলে এই নাটকের নামকরণ হয়েছে 'নব-বাসর'। 'নব-বাসর'-এ দৃশ্যপট হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে বৃন্দাবনের রাজপথ, বৃন্দাবন যমুনা-পুলিন, নন্দালয়, পার্ব্বতীয় পথ, দ্বারকার রাজবাটী, প্রভাসের প্রথম তোরণ, প্রমোদ-উদ্যান, গোলকধাম। 'বৃন্দাবনের রাজপথ' দৃশ্যে বৃন্দাবনবাসীর উপস্থিতিতে পথ মুখরিত।

ঘ. সামাজিক নাটক

'আনন্দময় নাটক'[৪৪] (১৮৯০)— মনোমোহন বসু। পাঁচ অংকের এই নাটকটিতে সঙ্গীতের প্রয়োগ রয়েছে। এর কাহিনী হচ্ছে, হাঁসপুরের জমিদার আনন্দময় চৌধুরীর পুত্র ভূষণবাবু স্ত্রী-পুত্র নিয়ে দূরদেশে থাকেন। মায়ের মৃত্যুর পর পিতাকে দেখার জন্য তিনি দেশে ফিরছিলেন। কান্তচন্দ্র মিত্র আনন্দময়বাবুর সর্বাধ্যক্ষ । আনন্দময়বাবুর ভালমানুষির সুযোগ নিয়ে তিনি তার বিষয়-সম্পত্তি আত্মসাৎ করার চেষ্টা করেছিলেন। ভূষণবাবু স্ত্রী-পুত্র নিয়ে দেশে ফিরছেন শুনে তিনি ডাকাত দিয়ে তাদের নৌকার উপর হামলা চালান। এতে মা, বাবা ও ছেলে তিনদিকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। ভূষণবাবুর স্ত্রী অন্তঃসত্ত্বা ছিলেন। তিনি হাঁসপুরের ঘাটে এসে ওঠেন। এখানে তিনি একজনের বাড়িতে আশ্রয় পান। যথা সময়ে তিনি ছেলে সন্তান প্রসব করেন এবং কান্তচন্দ্রের স্ত্রী একই দিনে কন্যা সন্তান প্রসব করেন। ধাই-এর কারসাজিতে দু'জনের সন্তান বদল হয়। কারণ কান্তচন্দ্রের স্ত্রী এর আগে সবগুলি কন্যা সন্তানের জন্ম দিয়েছিলেন। এর জন্য কান্তচন্দ্র স্ত্রীর উপর ক্ষিপ্ত। এবারও যদি কন্যাসন্তান জন্ম গ্রহণ করে তবে কান্তচন্দ্র স্ত্রীর উপর নির্যাতন করবেন। এই কারণেই এই সন্তান বদল করা হয়। ভূষণ বাবুর স্ত্রী সন্তান বদলের কথা জানতেন। পরিস্থিতির কারণে তাকে সব সহ্য করতে হয়। শেষপর্যন্ত অনেক বিপর্যয়ের মধ্যদিয়ে নাটকের শেষে ভূষণবাবু ও তার স্ত্রী-পুত্রের মিলন হয় এবং আনন্দময়বাবু তার ছেলে, ছেলে বউ ও নাতীকে ফিরে পান। কান্তচন্দ্র তার ভুল বুঝতে পেরে আনন্দময়বাবুর কাছে ক্ষমা প্রার্থণা করেন।

'আনন্দময় নাটক'কে পুরোপুরি সামাজিক নাটক বলা যায় না। আমাদের একথার সমর্থন মেলে অধ্যাপক বৈদ্যনাথ শীলের লেখায়। তাঁর মতে, ''সামাজিক নাটক না বলিয়া পারিবারিক রোমান্স বলা যায়। 'আনন্দময়' নাটকের উপর সমাজশক্তির প্রভাব কিছুই নাই।... 'আনন্দময়' নাটকে দৈব দুর্ঘটনা, সন্ন্যাসীর কৃপা, ভৈরবীর সহায়তা ইত্যাদিই ঘটনাকে নিয়ন্ত্রণ করিয়াছে।''[৪৫]

'হারানিধি'[৪৬] (১৮৯০)—গিরিশচন্দ্র ঘোষ। 'হারানিধি' পাঁচ অঙ্কের গদ্যে লেখা সামাজিক নাটক।

কাহিনীতে তৎকালীন নব্যবাবুয়ানার ছবি ফুটে উঠেছে। মোহিনীমোহন ও হরিশ বাল্যকালের বন্ধু। কিন্তু সম্পত্তির লোভে মোহিনীমোহন এক সময় হরিশের সমস্ত সম্পত্তি দখল করে তাকে মিথ্যে মামলায় আসামী করে। কাহিনীর শেষে গিয়ে মোহিনীমোহন তার ভুল বুঝতে পারে, হরিশ তার সম্পত্তি ফিরে পায় এবং দুই বন্ধুর মিলন হয়। নাটকটিতে সঙ্গীতের প্রয়োগ আছে। দৃশ্যপট হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে বৈঠকখানা, রাস্তা, কক্ষ, বাড়ির সম্মুখ, পথ, হাবড়ার পুলের ধার, কুটীর পার্শ্বে জঙ্গল, খিড়কির বাগান, বাড়ির ছাদ, কক্ষ-পার্শ্বের রাস্তা, উকিলের অফিস।

ঙ. ঐতিহাসিক নাটক

'স্বপ্নময়ী নাটক'[৪৭] (১৮৮২)—জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর। 'স্বপ্নময়ী নাটক'-এ সময় হিসেবে আরংজীবের রাজত্বকালকে দেখানো হয়েছে। ঐতিহাসিক মূল ঘটনা শুভ সিংহের বিদ্রোহ। পাঁচ অংকের এই নাটকটি গদ্যে লেখা। নাটকে উনিশটি গান ব্যবহার করা হয়েছে। এই উনিশটি গানের মধ্যে পনেরোটিই রবীন্দ্রনাথের লেখা। এ প্রসঙ্গে প্রশান্তকুমার পাল লিখেছেন—

> নাটকে ব্যবহৃত মোট উনিশটি গানের মধ্যে রবীন্দ্রসংগীতের সংখ্যাই পনেরোটি। তাছাড়া হিন্দুমেলার একাদশ অধিবেশন উপলক্ষে রচিত তাঁর 'দিল্লী দরবার' কবিতাটি কিছু পরিবর্তিত আকারে শুভ সিংহের স্বগতোক্তিরূপে চতুর্থ অঙ্ক চতুর্থ দৃশ্যে ব্যবহৃত হয়েছে।[৪৮]

'স্বপ্নময়ী'র কাহিনী হচ্ছে, চিতোয়া ও বর্দ্দার তালুকদার শুভসিংহ তার অনুচর সূরজমল-এর প্ররোচনায় দেবতার ছদ্মবেশ ধারণ করে। এই ছদ্মবেশ ধারণ করার কারণ সাধারণ মানুষদের উপর প্রভাব বিস্তার করে তাদের বিদ্রোহী করে তোলা এবং দেশকে মোঘলদের হাত থেকে উদ্ধার করা। বর্ধমানের রাজা কৃষ্ণরাম রায় মোঘল সম্রাটের অধীন। শুভসিংহের মতে সে কারণেই সে দেশের শত্রু। শুভসিংহের বাসনা প্রজাবিদ্রোহ ঘটিয়ে সে কৃষ্ণরামের কোষাগার লুঠ করবে এবং সেই অর্থে অস্ত্র ও সৈন্য সংগ্রহ করে দিল্লী আক্রমণ করবে। এদিকে কৃষ্ণরাম রায়ের কন্যা স্বপ্নময়ী শুভসিংহকে সত্যিকারের দেবতা বলে ভুল করে। শুভসিংহ তাকে বোঝায় যে তোমার বাবা দেশের শত্রু তাই তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে তার কোষাগার লুঠ করতে হবে। স্বপ্নময়ীর মনে দ্বন্দ্বের সুত্রপাত হয়, তারপরও একদিন তারই নেতৃত্বে শুভসিংহ ও সূরজমল কিছু বিদ্রোহী নিয়ে রাজপ্রাসাদ আক্রমণ করে। কিন্তু কৃষ্ণরাম ও তার পুত্র জগৎরায় শুভসিংহকে চিনতে পারে। শুভসিংহ এতদিন মিথ্যা দেবতা সেজে থাকার গ্লানিতে ভুগছিল। আজ সে তার ছদ্মবেশ ত্যাগ করে।

এদিকে সূরজমল বিদ্রোহীদের নিয়ে প্রাসাদে আগুন ধরিয়ে দেয়। রাজার মৃত্যু হয় এবং শুভসিংহ আত্মগ্লানিতে আত্মহত্যা করে। স্বপ্নময়ী শুভসিংহকে মনে প্রাণে দেবতা বলে গ্রহণ করেছিল। যখন তার দেবতার ছদ্মবেশ খুলে গেল এবং সে আত্মহত্যা করল আর তার পিতা অগ্নিদগ্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করল তখন স্বপ্নময়ী এই আঘাত সহ্য করতে না পেরে উন্মাদিনী হয়ে যায়।

'স্বপ্নময়ী নাটক'কে পুরোপুরি ঐতিহাসিক নাটক বলা যায় না। কল্পনার তীব্রতায় এ নাটক রোমান্টিকতা প্রাপ্ত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে প্রশান্তকুমার পাল মন্তব্য করেছেন—

> কৈলাসচন্দ্র সিংহের লেখা একটি ঐতিহাসিক প্রবন্ধ থেকে রবীন্দ্রনাথ যেমন তাঁর বউঠাকুরাণীর হাট উপন্যাস রচনার প্রেরণা পেয়েছিলেন, আমাদের ধারণা, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ উক্ত নাটিকার সূত্র তেমনি তাঁর অপর একটি প্রবন্ধ 'ক্ষিতিশ-বংশাবলী-চরিত' [ভারতী, ভাদ্র ১২৮৮। ১৯৭-২০৬] থেকে লাভ করেছিলেন। অবশ্য নাটকটির ঐতিহাসিক গুরুত্ব খুবই সামান্য, ইতিহাসের একটি ক্ষীণ সূত্র অবলম্বন করে রোমান্টিক গীতি মুখর নাট্য রচনার প্রয়াসই এখানে সমধিক পরিলক্ষিত হয়।[৪৯]

'স্বপ্নময়ী'র ঐতিহাসিকতা প্রসঙ্গে অজিতকুমার ঘোষ একই মন্তব্য করেছেন। তাঁর মতে, ''স্বপ্নময়ী'কে ঐতিহাসিক নাটক বলা যায় কি না সন্দেহ, কারণ ইতিহাসের পটভূমিকায় লিখিত হইলেও ইহা ঐতিহাসিক অতীত হইতে আমাদের দৃষ্টিকে বিসারিত করিয়া সামাজিক বর্তমানের উপর নিবদ্ধ করে।''[৫০] বঙ্গভঙ্গ বা স্বদেশী আন্দেলনের চিত্র জ্যোতিরিন্দ্রনাথের ঐতিহাসিক নাটক রচনার প্রধান প্রেরণা হওয়ার কারণেই নাটকে ঐতিহাসিকতার সঙ্গে রোমান্টিক স্বদেশ প্রীতির মিশেল ঘটেছে। 'স্বপ্নময়ী' নাটকেও এই প্রেরণা কাজ করেছে।

'স্বপ্নময়ী নাটক'-এর কাহিনীতে এক বিশেষ তাৎপর্য যুক্ত হয়েছে বলে আমাদের মনে হয়। এই সময়কালের এই একটিমাত্র নাটক যেখানে শুধুই কাহিনীর উপস্থাপন না হয়ে কাহিনী গভীর কোন অর্থ প্রকাশের প্রয়াস নিয়েছে। মানুষের বাইরের রূপে মুগ্ধ হলে বিপর্যয় অনিবার্য। এই রূপমুগ্ধতার কারণেই 'স্বপ্নময়ী নাটকে' বিপর্যয়ের সূচনা। এই নাটকের কাহিনীর ইংগিতময়তা রবীন্দ্রনাটকের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

'স্বপ্নময়ী নাটকে' দৃশ্যপট হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে বাটী, রাজসভা, গ্রাম্যপথ, ঘাট, অরণ্য, রাজ প্রাসাদ, রাজবাটীর বহিরুদ্যান, উদ্যান, বন, সমুদ্রতীর।

চ. জীবন চরিত মূলক নাটক

'চৈতন্যলীলা'[৫১] (১৮৮৬)— গিরিশচন্দ্র ঘোষ। নিমাই-এর জন্ম এবং তার সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণ করার বিষয় বস্তুকে নিয়ে লেখা হয়েছে 'চৈতন্যলীলা'। চার অঙ্কের এই নাটকটিতে সংলাপ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে গদ্য ও পদ্য ভাষা। নাটকটিতে সঙ্গীতের প্রয়োগ রয়েছে। 'চৈতন্যলীলা' প্রথম অভিনীত হয় ২ আগস্ট ১৮৮৪। অভিনয়ের সঙ্গে সঙ্গে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল নাটকটি। অমৃতলাল বসুর লেখা থেকে এই নাটকটির জনপ্রিয়তা অনুমান করা যায়। অমৃতলাল বসুর এই লেখাটির উল্লেখ করেছেন শ্রীদেবীপদ ভট্টাচার্য। অমৃতলাল বসু লিখেছেন—

> নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে, পল্লীতে পল্লীতে সংকীর্ত্তন সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইল, গীতা ও চৈতন্য-চরিতের বিবিধ সংস্করণে দেশ ছাইয়া পড়িল। বিলাত-প্রত্যাগত বাঙালী সন্তানও লজ্জিত না হইয়া সগর্বে আপনাকে হিন্দু হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিতে আরম্ভ করিল।[৫২]

নাটকটিতে দৃশ্যপট হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে - পাপের সভা, বনপথ, চন্ডীমন্ডপ, বাটী, গঙ্গাতীর, কানন-পথ, বাটীর সম্মুখ, রাজপথ, প্রাঙ্গণ এবং পথ।

'বুদ্ধদেব চরিত'[৫৩] (১৮৮৭)— গিরিশচন্দ্র ঘোষ। সিদ্ধার্থের জন্ম এবং সন্ন্যাস গ্রহণ এই নাটকের কাহিনী। গিরিশচন্দ্র এডুইন আরনল্ড (১৮৩২ - ১৯০৪) রচিত 'Light of Asia' নামক কাব্য গ্রন্থটি পাঠ করে 'বুদ্ধদেব চরিত' রচনা করেন। পাঁচ অঙ্কের পদ্যে লেখা এই নাটকটিতে সঙ্গীতের প্রয়োগ রয়েছে। বিদূষক ও সাধারণ মানুষের সংলাপে এসেছে গদ্য ভাষা। এই নাটকের ছাগবলি বন্ধের প্রসঙ্গটি রবীন্দ্রনাথের 'বিসর্জন' নাটকের কথা স্মরণ করায়। বলি বন্ধের ক্ষেত্রে এই নাটকের প্রভাব তৎকালীন সমাজে পড়েছিল। এ প্রসঙ্গে শ্রী দেবীপদ ভট্টাচার্য লিখেছেন—

> শিল্পরূপে 'বুদ্ধদেব চরিত' গিরিশচন্দ্রের রচিত সার্থক নাটকগুলির অন্যতম। এই নাটকের প্রভাব সমাজে কীভাবে পড়েছিল তার উল্লেখ করেছেন অবিনাশচন্দ্র তাঁর 'গিরিশচন্দ্র' গ্রন্থে: "শারদীয়া পূজার অব্যবহিত পূর্বে এই নাটকের অভিনয় দর্শনে বাগবাজারের সুপ্রসিদ্ধ জমিদার স্বর্গীয় রায় নন্দলাল বসু মহাশয়ের জীবহিংসায় এতদূর বিরাগ জন্মিয়াছিল যে, সেই বৎসর হইতেই তিনি তাঁহার বাটীতে "পূজায় বলিবন্ধ করেন এবং বলির নিমিত্ত সদ্যক্রীত ছাগগুলিকে মুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন।" (পৃ: ৩১১)।[৫৪]

দুই

১৮৮১ থেকে ১৮৯০-এর মধ্যে রচিত (রবীন্দ্রনাথ বাদে) উল্লেখযোগ্য নাটকগুলির বিস্তারিত আলোচনার পর আমরা এই সময়ের নাট্য রচনার কিছু সাধারণ বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করতে পারি। বিষয়বস্তু হিসেবে এই সময়ের নাটকে উঠে এসেছে ধর্ম, ইতিহাস ও সমাজ। পূর্বের পাশ্চাত্য রীতির অনুসরণে নাটক রচনা করা হলেও এই সময় মনোমোহন বসু প্রবর্তিত গীতাভিনয়ের ধারাই মূল স্রোতধারা হয়ে উঠেছে। এই স্রোতধারা কি কারণে উৎসারিত হল এবং মনোমোহন বসুর প্রেরণা কোথা থেকে জাগ্রত হল সে প্রসঙ্গে আমরা পূর্বেই আলোকপাত করেছি। এই অংশে আমরা মিলিয়ে দেখতে চাই রবীন্দ্রনাট্য চর্চার প্রথমপর্যায়ে অন্যান্য নাটকের সঙ্গে রবীন্দ্রনাটকের সাদৃশ্য ও বৈশাদৃশ্য কোথায়।

বাংলা নাটকে গানের প্রয়োগ বাংলা নাটক রচনার সূচনালগ্ন থেকেই প্রত্যক্ষ করা যায়। যতই পাশ্চাত্য রীতির অনুকরণে বাংলা নাটকের উদ্ভব হয়ে থাকুক না কেন সঙ্গীতের প্রয়োগের ক্ষেত্রে তা বাংলা যাত্রা পালারই স্পর্শ পেয়েছে। এই স্পর্শ হিন্দুমেলা এবং স্বাদেশিকতার হাওয়ায় মনোমোহন বসুর হাতে তীব্রতা লাভ করে। গীতাভিনয়ের প্রবর্তনা বলা যায় বাংলা নাট্যসাহিত্যের ক্ষেত্রে এক দিক বদলের ইংগিত। এই বদলের প্রবাহমানতায় রবীন্দ্রনাথ বিচ্ছিন্ন নন। এখানে এসেই রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে গীতাভিনয় ধারার নাট্যকাররা মিলে যান। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে এই মিলে যাওয়া মানে আত্মবিসর্জন নয়। বরং, শঙ্খ ঘোষ যাকে বলেছেন 'আত্ম আবিষ্কার', যদিও তার জন্য সময় লেগেছে অনেকটাই। শঙ্খ ঘোষ লিখেছেন—

> জনরুচিকে একদিক থেকে আরেক দিকে টান দেবার ইচ্ছা থেকেই কিছু যৌতুক দিতে হতো কখনো, গিরিশচন্দ্রদের তাই যাত্রা প্রভাবিত না হয়ে উপায় ছিল না। এই অর্থে যাত্রা অথবা সংস্কৃত নাটক এঁদের কাছে ছিল এমন এক বন্ধন, যাকে এড়িয়ে চলাই ছিল সমস্যা। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের হাতে এটাই এল মুক্তি পন্থা হিসেবে। কেননা তিনি তো আত্মরক্ষার কারণে আনেন নি এর ব্যবহার, এনেছিলেন আত্ম-আবিষ্কারের জন্য।[৫৫]

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে মনোমোহন এবং গিরিশচন্দ্রদের এখানেই তফাৎ। কিন্তু তফাৎ থাকলেও সবারই নজর পড়েছিল গিয়ে যাত্রার দিকে এবং সবারই মৌল চিন্তা ছিল একই, তা হল নাটককে দেশীয় করণ করা।

মনোমোহন বসু গানের জন্য নজর দিলেন যাত্রার দিকে আর রবীন্দ্রনাথ নজর দিলেন যাত্রার মঞ্চ স্বাধীনতার দিকে এবং ১৩০৯-এ লিখলেন, ''আমাদের দেশের যাত্রা আমার ঐ জন্য ভালো লাগে।''[৫৬] এই ভাললাগার সূত্র ধরেই নাটকে গানের প্রয়োগের বিষয়টিও চলে আসে। এ প্রসঙ্গে শঙ্খ ঘোষের মন্তব্য স্মরণ করা যেতে পারে, ''মঞ্চ ও দৃশ্যের পরিকল্পনায় যাত্রার সমীপবর্তী হবার সঙ্গে সঙ্গে ওই একই অভিপ্রায় তাঁর নাটকে বয়ে আনে গান।''[৫৭]

নাটকে সঙ্গীত প্রয়োগের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ আনুকুল্য পেয়েছিলেন ঠাকুরবাড়ীর সঙ্গীতের আবহাওয়ার। স্মরণ করা যেতে পারে যে রবীন্দ্রনাথের পূর্বে স্বর্ণকুমারী দেবী 'বসন্ত উৎসব' (১৮৭৯) নামে গীতিনাটক রচনা করেন। এ প্রসঙ্গে পশুপতি শাশমল লিখেছেন—

> ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যায় স্বর্ণকুমারী দেবী রবীন্দ্রনাথের পূর্বে গীতিনাট্য রচনা করেন; স্বর্ণকুমারীর প্রথম গীতিনাট্য বসন্ত উৎসব (নভেম্বর ১৮৭৯) রবীন্দ্রনাথের প্রথম গীতিনাট্য বাল্মীকি-প্রতিভার (ফাল্গুন ১২৮৭) পূর্বেই রচিত।[৫৮]

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরও লিখেছেন 'মানময়ী' (১৮৮০) নামে একটি ছোট গীতিনাট্য। পরে ১৮৯৯-এ নাটকটির কলেবর বৃদ্ধি করে 'পুনর্বসন্ত' নামে প্রকাশ করা হয়। সুতরাং নাট্যরচনার সূচনা লগ্নেই রবীন্দ্রনাথকে সাহায্য করেছিল গীতাভিনয়ের ধারা এবং ঠাকুরবাড়ীর সঙ্গীতের আবহাওয়া। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ নাট্য বিষয়ের ক্ষেত্রে নাট্য রচনার সূচনালগ্ন থেকেই যেমন হয়ে পড়লেন স্বতন্ত্র তেমনি নাটকে সঙ্গীতের প্রয়োগের ক্ষেত্রে নাট্যচর্চার প্রথম পর্যায়ে তিনি কোন স্বাতন্ত্র্যের স্বাক্ষর রাখতে পারেন নি। তাঁর পরিণত পর্যায়ের নাটকে সঙ্গীত যেমন বৈশিষ্ট্যমন্ডিত হয়ে উঠেছে, একাত্ম হয়ে গেছে নাট্যবিষয়ের সঙ্গে তেমনভাবে প্রথমপর্যায়ের নাটকে সঙ্গীত নাট্যবিষয়ের সঙ্গে একাত্ম হতে পারে নি। মনোমোহন বসু বা গিরিশচন্দ্ররা যেভাবে ব্যবহার করার কারণেই গানকে ব্যবহার করেছেন নাটকে তেমনি রবীন্দ্রনাটকের প্রথমপর্যায়ে গান দেখা দিয়েছে - শঙ্খঘোষের ভাষায় 'কুড়িয়ে-পাওয়া জিনিসের মতো'। তিনি লিখেছেন, ''অভ্যাসের প্রতাপ যে কতই ব্যাপক তা আমরা ধরতে পারি যখন দেখি রবীন্দ্রনাথও তাঁর প্রাথমিক নাট্য চর্চায় গানকে ব্যবহার করেন যেন কুড়িয়ে-পাওয়া জিনিসের মতো, ইতস্তত, অনেকটাই প্রথাসিদ্ধ ধরনে।''[৫৯] সুতরাং রবীন্দ্রনাট্য চর্চার প্রথম পর্যায়ের নাটকগুলির সঙ্গে অন্যান্য নাটকের প্রধান এবং মূলত: একমাত্র সাদৃশ্য রইল সঙ্গীত প্রয়োগের ক্ষেত্রে আর অন্য ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ পুরোপুরিভাবেই রইলেন স্বতন্ত্র। তবুও ছোট খাটো যে দু'একটি সাদৃশ্য আমাদের নজরে এসেছে তা আলোচনা করে নেওয়া যেতে পারে।

রবীন্দ্রনাটকে সাধারণ জনতার উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। এই জনতা চরিত্রের একটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য আছে। তারা ভীরু এবং কুসংস্কারাচ্ছন্ন। রবীন্দ্র নাট্যচর্চার প্রথমপর্যায়ে 'প্রকৃতির প্রতিশোধ', 'রাজা ও রানী' এবং 'বিসর্জন' নাটকে এই জনতা চরিত্রের উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। এই সময়ের অন্যান্য নাটকে সাধারণ জনতার উপস্থিতি থাকলেও তারা রবীন্দ্রনাটকের বিশিষ্ট জনতার মতো নয়। এই পর্যায়ের অন্যান্য নাটকে যেমন 'বৃষকেতু', 'যদুবংশ', 'বেল্লিক বাজার', 'স্বপ্নময়ী' ইত্যাদি নাটকে সাধারণ মানুষের উপস্থিতি রয়েছে। কিন্তু একমাত্র 'স্বপ্নময়ী' নাটকের জনতা চরিত্রের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে 'প্রকৃতির প্রতিশোধ', 'রাজা ও রানী' এবং 'বিসর্জন' নাটকের জনতা চরিত্রের সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়। 'স্বপ্নময়ী' নাটকে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সাধারণ জনতাকে চিহ্নিত করেছেন 'ইতরলোক' হিসেবে। এই 'ইতরলোক' ভীরু এবং কুসংস্কারাচ্ছন্ন। তারা শুভসিংহের দেবতার সাজকে খুব বিশ্ময় নিয়ে প্রত্যক্ষ করেছে এবং তাদের অন্তরের কামনা-বাসনার কথা প্রকাশ করেছে এই মিথ্যা দেবতার কাছে। এ প্রসঙ্গে ভূদেব চৌধুরী যথার্থ মন্তব্য করেছেন, ''রবীন্দ্রনাথের বহু নাটকে জনসাধারণের স্বভাব-বর্ণনায় তাদের সরলতা, অস্থির-চিত্ততা, পরমুখাপেক্ষিতা ইত্যাদি সহজ দুর্বলতা নিয়ে সস্নেহ কৌতুক করা হয়েছে। 'স্বপ্নময়ী'র 'ইতরলোক'-এর চিত্রনে এই রস প্রকরণের সার্থক পূর্বসূত্র লক্ষিত হয়ে থাকে।''[৬০]

রবীন্দ্র নাটকে 'পথ'-এর প্রয়োগ ভিন্ন তাৎপর্যে সমুজ্জল। এ প্রসঙ্গে আমরা ''রবীন্দ্রনাটকের প্রথমপর্যায়ে পরিণত পর্যায়ের বীজানুসন্ধান'' অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। দৃশ্যপটে পথের অনুষঙ্গ এই সময়ের অন্যান্য নাটকে দেখা যায়। কিন্তু 'পথ' কোন প্রতীকী তাৎপর্য লাভ করতে পারেনি। যেমন 'স্বপ্নময়ী', 'বৃষকেতু', যদুবংশ ধ্বংস', 'বেল্লিক বাজার', 'নব-বাসর', হারানিধি' প্রায় প্রতিটি নাটকে দৃশ্যপট হিসেবে দেখা দিয়েছে 'পথ'। এইসব পথে নানা শ্রেনীর মানুষের উপস্থিতি দেখা যায়, যেমন রবীন্দ্রনাটকে পথের দৃশ্যপটে সাধারণ মানুষের উপস্থিতি আমাদের নজরে আসে। কিন্তু রবীন্দ্রনাট্য চর্চার প্রথম পর্যায়ের কোন কোন নাটকে 'পথ' যেমন প্রতীকের পরমার্থত্ব লাভ করেছে তেমনি সেই সময়কালের বিভিন্ন নাটকে পথের অনুষঙ্গ এলেও 'পথ' শুধু পটভূমিই রয়ে গেছে প্রতীক হতে পারেনি অথবা সম্পৃক্ত হতে পারেনি নাট্যবিষয়ের সঙ্গে।

গিরিশচন্দ্রের 'বুদ্ধদেব চরিত' নাটকের সঙ্গে 'বিসর্জন' নাটকের একটি জায়গায় সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়। সাদৃশ্যটি হচ্ছে - বলি প্রথা বন্ধের ক্ষেত্রে। রাজা বিম্বিসা পুত্রসন্তান কামনায় যজ্ঞের আয়োজন করে। সেই যজ্ঞে ছাগ বলি দেওয়া হবে বলে এক রাখাল রাজার আদেশে তার ছাগ নিয়ে চলেছে যজ্ঞ স্থলে। রাখালের সঙ্গে সিদ্ধার্থের দেখা হয়। সিদ্ধার্থ রাখালের কাছে এই বলির কথা জানতে পেরে যজ্ঞস্থলে গিয়ে হাজির হয় এবং রাজাকে এই বলি বন্ধ করতে অনুরোধ করে। সিদ্ধার্থ রাজাকে বোঝাতে সক্ষম হয়

যে এই নিরীহ প্রাণী হত্যা করা উচিত নয়। রাজা বিম্বিসা সিদ্ধার্থের কথায় অনুপ্রাণিত হয়ে বলি বন্ধ করেন এবং তার রাজ্যে বলি নিষিদ্ধ করে দেন। এখানে লক্ষ করবার বিষয় যে দুটি নাটকেই ('বুদ্ধদেব চরিত' এবং 'বিসর্জন') ছাগবলির আয়োজন হয়েছে সন্তান কামনা থেকে। পার্থক্য শুধু 'বিসর্জন'-এ সন্তান কামনা করেছে 'রানী' আর 'বুদ্ধদেব চরিত'-এ রাজা।

রাধানাথ মিত্রের 'আশালতা' নাটকের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের 'মায়ার খেলা' গীতিনাট্যের সাদৃশ্যের কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়া মনোমোহন বসুর 'পার্থপরাজয়' নাটকের একটি দৃশ্যের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের 'বাল্মীকি-প্রতিভা'র একটি দৃশ্যের সাদৃশ্য লক্ষ করা গেছে। 'পার্থপরাজয়' নাটকে অর্জুন ও বভ্রুবাহনের যুদ্ধে অর্জুন পক্ষের সৈন্য ঘ'নো ও র'নো যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে এসে নিজেদের মধ্যে যে কথা বলে তা 'বাল্মীকি-প্রতিভা'র শিকার থেকে পালিয়ে আসা দস্যুদের সংলাপকে স্মরণ করিয়ে দেয়। আমরা দু'টি নাটক থেকে কিছু সংলাপ উদ্ধৃত করছি —

ঘ'নো । তোর কপালে দুঃখ আছে, তা আমি কর্ব্বো কি? ব'ল্লুম "ছোঁড়া পালিয়ে আয়"—মদ্দানি করে তাল ঠুকে রণ ক'ত্তে গেলেন!—বড় নাকি বীরের বেটা বীর... ।

র'নো । আমি কি সাদে গ্যালাম, হয়গ্রীব খুড়ো গলাটিপে ব'ল্লে, পালাবি তো ম'র্ব্বি —ডেকে ব'লতি না'গ্‌লো, শুত্তি পেলিনে—যে পালাবে বের্ষোকেতু তারি কাটি ফেলাবে।

ঘ'নো । আ হাবা'তে। এও জানিসনে "নুকিয়ে খায়, শুকিয়ে যায়!" সে কতাতো সব্বাইকে ব'ল্লে, তবে অনেকে পালালো কেমন করে? আমি সরে এনু কি করে? ... ('পার্থপরাজয়' নাটক)

প্রথম দস্যু। প্রাণ নিয়ে তো সট্‌কেছিরে, করবি এখন কী!
ওরে বরা, করবি এখন কী!
বাবারে, আমি চুপ করে এই কচুবনে লুকিয়ে থাকি। ...
(খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে আর একজন দস্যুর প্রবেশ)।

অন্য দস্যু। বলব কী আর বলব খুড়ো — উঁ উঁ!
আমার যা হয়েছে বলি কার কাছে —
একটা বুনো ছাগল তেড়ে এসে মেরেছে টুঁ।

প্রথম দস্যু। তখন যে ভারি ছিল জারি জুরি,
এখন কেন করছ বাপু উঁ উঁ উঁ —
কোনখানে লেগেছে বাবা, দিই একটু ফুঁ। (বাল্মীকি-প্রতিভা)

এই সাদৃশ্য গুলি হয়তো রবীন্দ্রনাথের অজ্ঞাত সারেই দেখা দিয়েছে তাঁর নাটকে। অন্যান্য নাটকে যে পথের অনুষঙ্গ এসেছে, সাধারণ জনতা ভীড় করেছে নাট্য কাহিনীতে রবীন্দ্রনাথ হয়তো সেখান থেকে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন নাটকে পথ এবং জনতা চরিত্রের প্রয়োগ ঘটাতে। যদিও রবীন্দ্রপ্রতিভায় 'পথ' পেল প্রতীকের পরমার্থতা এবং জনতা চরিত্র হয়ে উঠল রাবীন্দ্রিক বিশিষ্ট জনতা।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর নাট্য রচনার শুরু থেকেই কখনো জনরুচির দিকে নজর রেখে নাটক রচনা করেননি কিন্তু অন্যান্য নাট্যকারদের মূল নজর ছিল জনরুচির দিকেই। রবীন্দ্রনাথ সূচনা লগ্ন থেকেই নাটক রচনার ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র। এই স্বতন্ত্রতা দেখা দিয়েছে pattern-এর দিক থেকে এবং বিষয় বস্তুর দিক থেকে। রবীন্দ্রসমকালে অন্যান্য নাট্যকর্মে বিষয়বস্তু প্রধানত তিন ভাবে ধরা দিয়েছে —

এক. ধর্মীয় মাহাত্ম্য প্রচার মূলক ।
দুই. সমাজ বিষয়ক।
তিন. ঐতিহাসিক ।

পুরাণের বিষয়বস্তু নিয়ে কাহিনী রচিত হলেও পুরাণ কালোপযোগী হয়নি অথবা হয়নি কালোত্তীর্ণ। পুরাণে বর্ণিত কাহিনী ঠিক যেন ফটোকপির মতো উঠে এসেছে নাটকে। এ কারণেই ধর্মীয় মাহাত্ম্য প্রচারই যেন এ সময়কার নাটকগুলির মূল উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। একই সময়ে অর্থাৎ ১৮৮১ থেকে ১৮৯০-এর মধ্যে রবীন্দ্রনাথ যা লিখলেন তা সমকালীন নাট্যচর্চার মূল স্রোত থেকে বিষয়গত দিক থেকে হয়ে পড়লো স্বতন্ত্র। তিনি সমকালীন নাট্য কাহিনীর কোন কিছুই গ্রহণ না করে কাহিনীতে নিয়ে এলেন দেশকাল হীন এক চিরকালীন ভাবসত্যের প্রকাশ। আমরা 'রবীন্দ্রনাট্যের অভিব্যক্তির ধারা' অধ্যায়ে এই কাহিনী বিন্যাসের বিশ্লেষণ করেছি। সেই বিশ্লেষণে ধরা পড়েছে 'রুদ্রচন্ড' (১৮৮১) থেকে 'বিসর্জন' (১৮৯০) পর্যন্ত একই কাহিনী বিন্যাসের সম্প্রসারণ। যেখানে রয়েছে মানবিক উত্তরণের বিষয়, আত্মমুক্তির বিষয়, সর্বোপরি অশ্রুকুমার সিকদার যাকে বলেছেন ''বন্ধন থেকে মুক্তি।''[৬১] এখানে একটি প্রশ্ন স্বাভাবিক ভাবে উত্থাপিত হতে পারে রবীন্দ্রনাথ কেন প্রচলিত প্রথায় নাট্য রচনায় মনোনিবেশ করলেন না? শুরুতেই কেন বিষয়গত দিক থেকে হয়ে পড়লেন স্বতন্ত্র? কোন অনুপ্রেরণা কাজ করছিল এর পিছনে? আমরা এ প্রসঙ্গে 'রবীন্দ্রনাথ কবি ও নাট্যকার' এবং 'রবীন্দ্রনাটকের প্রথম পর্যায়ে পরিণত পর্যায়ের বীজানুসন্ধান' অধ্যায়ে আলোচনা

করেছি। সে আলোচনায় আমাদের কাছে পরিষ্কার হয়ে গেছে যে রবীন্দ্রনাথের স্বকালে অন্যান্য নাটক থেকে রবীন্দ্রনাটক পৃথক হয়ে যাওয়ার পিছনে কাজ করেছে গীতিকবির আত্মোপলব্ধির প্রবণতা। এই আত্মোপলব্ধির কারণেই নাট্যকাহিনীতে সৃজন হয়েছে আত্মমুক্তির কথা। কবির রোমান্টিক মনোভঙ্গিই ভিন্ন করে দিয়েছে অন্যান্য নাট্যকারদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের নাট্য-পথের। সে পথ চিরকালীন, স্থান এবং কালের গন্ডী অতিক্রম করা এক idea-র প্রকাশ।

নির্দেশিকা

১. বসু, বিষ্ণু , *বাংলা নাট্যরীতি*, প্রথম পুনশ্চ সংস্করণ ১৯৯৬, কলকাতা। পৃ: ১৩।

২. ভট্টাচার্য, শ্রী আশুতোষ, *বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস* (১ম খন্ড), আদিযুগ, তৃতীয় সংস্করণ ১৯৬৮। এ, মুখার্জী এ্যান্ড কোং প্রা: লি: কলকাতা। পৃ: ১১৬।

৩. এই উদ্ধৃত অংশটি আশুতোষ ভট্টাচার্য-এর *বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস* (১ম খন্ড), মধ্য যুগ, থেকে গৃহীত, ঐ, পৃ: ৯।

৪. বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ, *বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস*, ১৩৬৮। পৃ: ১৭-১৮।

৫. ঐ, পৃ: ১৮।

৬. *বান্ধব*, বৈশাখ, ১২৮৮।

৭. ঘোষ, অজিতকুমার, *বাংলা নাটকের ইতিহাস*, জেনারেল প্রিন্টার্স এ্যান্ড পাব্‌লিশার্স প্রা: লি:। কলকাতা। পঞ্চম সংস্করণ মার্চ ১৯৭০। পৃ: ১৫২।

৮. এই উদ্ধৃত অংশটি অজিতকুমার ঘোষ-এর *বাংলা নাটকের ইতিহাস গ্রন্থ* থেকে গৃহীত। পৃ: ১৫২।

৯. ভট্টাচার্য, শ্রী আশুতোষ, *বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস* (১ম খন্ড), মধ্যযুগ। পৃ: ৩১।

১০. মিত্র, ড: অরুণকুমার, *অমৃতলাল বসুর জীবনী ও সাহিত্য*, নাভানা, কলকাতা। প্রথম সংস্করণ জানুয়ারী ১৯৭০। পৃ: ১৬৭।

১১. ঐ, পৃ: ২২৭।

১২. ভট্টাচার্য, শ্রী আশুতোষ, *বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস* (১ম খন্ড), মধ্যযুগ। পৃ: ৫৩ - ৫৪।

১৩. সেন, সুকুমার, *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস* (২য় খন্ড), ইস্টার্ণ পাব্‌লিশার্স, কলকাতা। সপ্তম সংস্করণ ১৯৮৬। পৃ: ৩৪১।

১৪. ঘোষ, অজিতকুমার, *বাংলা নাটকের ইতিহাস*। পৃ: ১১৭।

১৫. বসু, শ্রী মনোমোহন, *পার্থপরাজয়*, দ্বিতীয় মুদ্রণ। ফাল্গুন ১২৯৩ সাল। কলিকাতা ৩৩ নং করন্‌ওয়ালিস স্ট্রীট, মধ্যস্থ যন্ত্রে বেঙ্গল পাবলিশিং কোম্পানি দ্বারা মুদ্রিত।

১৬. ব্যবহৃত গ্রন্থটির প্রথম পৃষ্ঠা না থাকার কারণে এর প্রকাশনা সংস্থার নাম এবং সন-তারিখ পাওয়া যায় নি।

১৭. ঘোষ, গিরিশচন্দ্র, *সীতারবনবাস*, *গিরিশ রচনাবলী*—১ম খন্ড। সম্পাদনা ড: রথীন্দ্রনাথ রায় ও ড: দেবীপদ ভট্টাচার্য। সাহিত্য সংসদ, কলকাতা। প্রথম প্রকাশ - আগষ্ট ১৯৬৯।

১৮. ঘোষ, গিরিশচন্দ্র, বৃষকেতু *গিরিশ রচনাবলী*— ৪র্থ খন্ড। সম্পাদনা ড: দেবীপদ ভট্টাচার্য। সাহিত্য সংসদ, কলকাতা। প্রথম প্রকাশ - ১৯৭৪।

১৯. ভট্টাচার্য, ড: দেবীপদ, 'গিরিশচন্দ্র ঘোষ সাহিত্য সাধনা', *গিরিশ রচনাবলী*— ৪র্থ খন্ড। ঐ, পৃ: সতের।

২০. রায়, শ্রী রাজকৃষ্ণ, *যদুবংশ ধ্বংস*, ৯৭ নং কলেজ স্ট্রীট, বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরী হইতে শ্রী গুরুদাস চট্টপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত ও ৩৭ নং মেছুয়া বাজার স্ট্রীট বীণা যন্ত্রে শ্রী শরচ্চন্দ্র দেব কর্ত্তৃক মুদ্রিত। ১২৯০।

২১. রায়, শ্রী রাজকৃষ্ণ, *তরণী সেন বধ*। ঐ, ১২৯১।

২২. ঘোষ, গিরিশচন্দ্র, *নল দময়ন্তী*, *গিরিশ রচনাবলী*—প্রথম খন্ড। ১৯৬৯।

২৩. ভট্টাচার্য, ড: দেবীপদ, *'গিরিশচন্দ্র ঘোষ সাহিত্য সাধনা'*, ঐ, পৃ: একচল্লিশ।

২৪. ঘোষ, গিরিশচন্দ্র, দক্ষযজ্ঞ, গিরিশ রচনাবলী—২য় খন্ড। সম্পাদনা - ড: দেবীপদ ভট্টাচার্য। সাহিত্য সংসদ, কলকাতা। প্রথম প্রকাশ - মে ১৯৭১।

২৫. ভট্টাচার্য, ড: দেবীপদ, ঐ, পৃ: একুশ।

২৬. ভট্টাচার্য, শ্রী আশুতোষ, *বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস* (১ম খন্ড), মধ্যযুগ। পৃ: ১৬৩।

২৭. *অমৃত গ্রন্থবলী* - চতুর্থ ভাগ। শ্রী উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় কত্তৃক প্রকাশিত, বসুমতী কার্য্যালয়। ১৩১৭।

২৮. মিত্র, ড: অরুণকুমার, *অমৃতলাল বসুর জীবনী ও সাহিত্য*, নাভানা, কলকাতা। প্রথম প্রকাশ - জানুয়ারী ১৯৭০। পৃ: ২৪০।

২৯. বসু, অমৃতলাল, *বিবাহ-বিভ্রাট*, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এন্ড সন্স, ২০৩/১/১ করন্ওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা। অষ্টম সংস্করণ।

৩০. মিত্র, ড: অরুণকুমার, *অমৃতলাল বসুর জীবনী ও সাহিত্য*। পৃ: ২৪৩।

৩১. ঐ, পৃ: ২৪৪।

৩২. *জ্যোতিরিন্দ্র গ্রন্থাবলী* (চতুর্থ ভাগ), বসুমতি সাহিত্য মন্দির। শ্রী সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত, কলিকাতা, ১৬৬ নং বহুবাজার স্ট্রীট।

৩৩. ঘোষ, অজিতকুমার, *বাংলা নাটকের ইতিহাস*। পৃ: ১৬৩।

৩৪. *গিরিশ রচনাবলী*—প্রথম খন্ড। সম্পাদনা - ড: রথীন্দ্রনাথ রায় ও ড: দেবীপদ ভট্টাচার্য। সাহিত্য সংসদ, কলকাতা। প্রথম প্রকাশ - আগস্ট ১৯৬৯।

৩৫. ভট্টাচার্য, শ্রীদেবীপদ, 'গিরিশচন্দ্র ঘোষ সাহিত্য সাধনা', ঐ, পৃ: তেতাল্লিশ।

৩৬. দাস, উপেন্দ্রনাথ, *দাদা ও আমি*, কলিকাতা বহুবাজার, শ্রীনাথ দাসের গলি, ১৭ নং ভবন, "সময়" কার্যালয়ে শ্রী অমৃতলাল ঘোষ দ্বারা মুদ্রিত। সন ১২৯৫।

৩৭. বসু, অমৃতলাল, *তাজ্জব ব্যাপার*,কলিকাতা, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এন্ড সন্স, ৭৯ নং করন্ওয়ালিস স্ট্রীট, ষ্টার থিয়েটার হইতে শ্রী অমৃতলাল বসু কর্ত্তৃক প্রণীত ও প্রকাশিত। দ্বিতীয় সংস্করণ, ১২৯৭ সাল।

৩৮. ভট্টাচার্য, শ্রী দেবীপদ, 'গিরিশচন্দ্র ঘোষ সাহিত্য সাধনা', *গিরিশ রচনাবলী*—২য় খন্ড। পৃ: বাহান্ন।

৩৯. *গিরিশ রচনাবলী*—২য় খন্ড। ঐ।

৪০. ভট্টাচার্য, শ্রী আশুতোষ, *বাংলা নাট্য সাহিত্যের ইতিহাস* -১ম খন্ড, মধ্যযুগ। পৃ: ১৬০।

৪১. ভট্টাচার্য, ড: দেবীপদ, 'গিরিশচন্দ্র ঘোষ সাহিত্য সাধনা', *গিরিশ রচনাবলী*—২য় খন্ড। পৃ: আটাশ।

৪২. *রাধানাথ গ্রন্থাবলী*, শ্রী রাধানাথ মিত্র প্রণীত। কলিকাতা, ১৬৬ নং বহুবাজার স্ট্রীট, "বসুমতি ইলেক্‌টো মেসিন যন্ত্রে" শ্রী পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত। ১৩১৯।

৪৩. ঐ।

৪৪. বসু, শ্রী মনোমোহন, *আনন্দময় নাটক*, কলিকাতা, বসু কোম্পানি কর্ত্তৃক ২৯/১ নং করন্ওয়ালিস স্ট্রীট, মনোমোহন লাইব্রেরী হইতে প্রকাশিত। আষাঢ়, ১২৯৭।

৪৫. শীল, অধ্যাপক বৈদ্যনাথ, *বাংলা সাহিত্যে নাটকের ধারা*, এ. কে. সরকার এ্যান্ড কোং, কলকাতা। পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত তৃতীয় সংস্করণ । পৃ: ১৫২।

৪৬. *গিরিশ রচনাবলী*—২য় খন্ড।

৪৭. *জ্যোতিরিন্দ্র গ্রন্থাবলী* - পঞ্চম ভাগ, শ্রী সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত। কলিকাতা। ১৬৬ নং বহুবাজার স্ট্রীট, বসুমতি সাহিত্য মন্দির।

৪৮. পাল, প্রশান্তকুমার, *রবিজীবনী* - ২য় খন্ড। আনন্দ পাবলিশার্স প্রা: লি:, প্রথম আনন্দ সংস্করণ জানুয়ারি ১৯৯০। পৃ: ১৩৪।

৪৯. ঐ, পৃ: ১৩৩।

৫০. ঘোষ, অজিতকুমার, *বাংলা নাটকের ইতিহাস*। পৃ: ১৫৯।

৫১. *গিরিশ রচনাবলী*—২য় খন্ড।

৫২. ভট্টাচার্য, শ্রীদেবীপদ, 'গিরিশচন্দ্র ঘোষ: সাহিত্য সাধনা', *গিরিশ রচনাবলী*—২য় খন্ড, পৃ: তেতাল্লিশ।

৫৩. *গিরিশ রচনাবলী*—২য় খন্ড, ঐ।

৫৪. ভট্টাচার্য, শ্রীদেবীপদ, 'গিরিশচন্দ্র ঘোষ: সাহিত্য সাধনা', *গিরিশ রচনাবলী*—২য় খন্ড, পৃ: ছত্রিশ।

৫৫. ঘোষ, শঙ্খ, 'নাট্যমুক্তি ও রবীন্দ্রনাথ', *কালের মাত্রা ও রবীন্দ্রনাটক*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, চতুর্থ সংস্করণ ১৯৯৫ । পৃ: ১৫।

৫৬. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'রঙ্গমঞ্চ', *বিচিত্র প্রবন্ধ*, *রবীন্দ্ররচনাবলী* - চতুর্দ্দশ খন্ড, জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ২৫ বৈশাখ ১৩৬৮ । পৃ: ৭৪৪।

৫৭. ঘোষ, শঙ্খ, 'নাটকে গান', *কালের মাত্রা ও রবীন্দ্রনাটক*, দে'জ পাবলিশিং,কলকাতা, চতুর্থ সংস্করণ ১৯৯৫ । পৃ: ১৩৪।

৫৮. শাশমল, পশুপতি, *স্বর্ণকুমারী ও বাংলা সাহিত্য*, বিশ্বভারতী, প্রথম প্রকাশ, পৌষ ১৩৭৮। পৃ:৩০১।

৫৯. ঘোষ, শঙ্খ, 'নাটকে গান', *কালের মাত্রা ও রবীন্দ্রনাটক*। পৃ: ১৩৩।

৬০. চৌধুরী, শ্রী ভূদেব, *বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা*, [দ্বিতীয় পর্যায়], বুকল্যান্ড প্রা: লি: কলকাতা, ৩য় সংস্করণ, ১৫ই ডিসেম্বর ১৯৬৪ । পৃ: ৪৯৭।

৬১. "রবীন্দ্রনাট্যে প্রধান বিষয় বন্ধন থেকে মুক্তি।" - অশ্রুকুমার সিকদার, *রবীন্দ্রনাট্যে রূপান্তর ও ঐক্য*, প্রথম আনন্দ সংস্করণ জানুয়ারি ১৯৯৩। কোলকাতা। পৃ: ২০৯।